চার - ইয়ারি কথা

প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য বই

প্রবন্ধসংগ্রহ

বীরবলের হালখাতা

রায়তের কথা

হিন্দু সংগীত

182. Oc. 916. 21(1)

চার-ইয়ারি কথা

প্রমথ চৌধুরী

NATIONAL LIBRARY
No. 660
Date 17.9.54
CALCUTTA

বিশ্বভারতী

চার - ইয়ারি কথা

প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য বই

প্রবন্ধসংগ্রহ

বীরবলের হালখাতা

রায়তের কথা

হিন্দু সংগীত

3|4|/

182. Oe. 916. 21(1)

চার-ইয়ারি কথা

প্রমথ চৌধুরী

NATIONAL LIBRARY
No. 660
Date 17.9.54
CALCUTTA

বিশ্বভারতী

WEST BENGAL

182. Oc. 916. 21(1).

SHELF LISTED

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

করকমলেষু

আমরা সেদিন ক্লাবে তাসখেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে, রাত্তির যে কত হয়েছে সে দিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এরকম গলাভাঙা ঘড়ি কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙা কাঁসির চাইতেও তার আওয়াজ বেশি বাজখাঁই, এবং সে আওয়াজের রেশ কানে থেকেই যায়— আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্বপরিচিত, কিন্তু সেদিন, কেন জানি নে, তার খ্যান্‌খ্যানানিটে যেন নূতন করে বিশেষ করে আমাদের কানে বাজল।

হাতের তাস হাতেই রেখে কী করব ভাবছি, এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুয়োরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বয়, গাড়ি জোত্‌নে বোলো।

পাশের ঘর থেকে উত্তর এল, যো হুকুম।

সেন বললেন, এত তাড়া কেন। এ হাতটা খেলেই যাও-না।

সীতেশ। বেশ! দেখছ না কত রাত হয়েছে! আমি আর এক মিনিটও থাকব না। এমনিই তো বাড়ি গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে?

সীতেশ। স্ত্রীর—

সোমনাথ উত্তর করলেন, ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারও নেই?

সীতেশ। তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতে তোমরা কখন আস-যাও, তাতে তাদের কিছু আসে-যায় না।

সেন বললেন, সে কথা ঠিক। তবে একদিন একটু দেরি হয়েছে, তার জন্য—

সীতেশ। একটু দেরি? আমার মেয়াদ আটটা পর্যন্ত— আর এখন

দশটা। আর, এ তো একদিন নয়, প্রায় রোজই বাড়ি ফিরতে তোপ পড়ে যায়।

আর রোজই বকুনি খাও?

খাই নে?

তা হলে সে বকুনি তো আর গায়ে লাগবার কথা নয়। এতদিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায় নি?

সীতেশ। এখন ইয়ার্কি রাখো, আমি চললুম। গুড নাইট।

এই কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন এমন সময় বয় এসে খবর দিলে যে, কোচমান-লোগ আবি গাড়ি জোত্‌নে নেই মাঙ্‌তা। ও লোগ সমজ্‌তা দো-দশ মিন্‌ট্‌মে জোর পানি আয়েগা, সায়েত্‌ হাওয়া ভি জোর করেগা। ঘোড়ালোগ আস্তাবল্‌মে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়। রাস্তামে নিকাল্‌নেসে জরুর ভড়্‌কেগা, সায়েত্‌ উখড় যায়েগা। কোই আধা ঘণ্টা দেখ্‌কে তব্‌ সোয়ারি দেনা ঠিক হ্যায়।

এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠলুম; কেননা, একা সীতেশের নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কি না তাই দেখবার জন্য আমরা চার জনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এ দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর-এক পৃথিবীর আর-এক আকাশ— দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিংবা চোখের সুমুখে কোথাও ঘনঘটা করে নেই, আশেপাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই; মনে হল, যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে— ছাইরঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যেরকম আলো দেখা যায়, সেইরকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনো দেখি নি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির

দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। চার পাশে তাকিয়ে দেখি, গাছপালা বাড়িঘরদোর সব যেন কোনো আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে। মরার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যেরকম কৌতূহল মিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক দুই একসঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক, বৃষ্টি নামুক, বিদ্যুৎ চমকাক, বজ্র পড়ুক, নয় আরো ঘোর করে আসুক, সব অন্ধকারে ডুবে যাক। কেননা, প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্তের পর মুহূর্তে অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলুম না। অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম, কেননা এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি, আমার তিনটি বন্ধুই যিনি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন; সকলের মুখই গম্ভীর, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি এই দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করে বললুম, বয়, চারঠো আধা পেগ লাও। এই কথা শুনে সকলেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোমনাথ বললেন, আমার জন্য পেগ নয়, ভারমুথ। তার পর আমরা যে-যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ধরালুম। আবার সব চুপ। যখন বয় পেগ নিয়ে এসে হাজির হল তখন সীতেশ বলে উঠলেন, মেরা ওয়াস্তে আধা নেই, পুরা।

আমি হেসে বললুম, I beg your pardon, স্থূল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম।

সীতেশ একটু বিরক্ত স্বরে উত্তর করলেন, তোমাদের মত আমি বামন-অবতারের বংশধর নই।

না, অগস্ত্যমুনির। এক চুমুকে তুমি সুরাসমুদ্র পান করতে পার।

এ কথা শুনে তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, দেখো রায়, ওসব বাজে রসিকতা এখন ভালো লাগছে না।

আমি কোনো উত্তর করলুম না, কেননা বুঝলুম যে কথাটা ঠিক। বাইরের ওই আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল, এবং সেইসঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্তমধ্যে আমরা নতুন ভাবের মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। যেসকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার সেসকল মন থেকে ঝরে গিয়ে তার বদলে দিনের আলোয় যা-কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।

সেন বললেন, যেরকম আকাশের গতিক দেখছি তাতে বোধ হয় এখানেই রাত কাটাতে হবে।

সোমনাথ বললেন, ঘণ্টাখানেক না দেখে তো আর যাওয়া যায় না।

তার পর সকলে নীরবে ধূমপান করতে লাগলুম।

খানিক পরে সেন আকাশের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন, আমরা একমনে তাই শুনতে লাগলুম।

সেনের কথা

দেখতে পাচ্ছ, বাইরে যা-কিছু আছে, চোখের পলকে সব কিরকম নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; যা জীবন্ত তাও মৃতের মত দেখাচ্ছে; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাক্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে, রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে, এর পর আর কিছুই নেই। তুমি আমি সকলেই জানি যে, এ কথা সত্য নয়। এই দুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোর মায়াতে আমাদের অভিভূত করে রেখেছে বলেই এখন আমাদের চোখে যা সত্য তাও মিছে ঠেকছে। আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের কাছে বিশ্বের মানে বদলে যায়। এর প্রমাণ

আমি পূর্বেও পেয়েছি। আমি আর-একদিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম— যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠেছিল ; যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।

সে বহুদিনের কথা। তখন আমি সবে এম. এ. পাশ করে বাড়িতে বসে আছি। কিছু করি নে, কিছু করবার কথা মনেও করি নে। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা রোজগার করবার আবশ্যকও ছিল না, অভিপ্রায়ও ছিল না। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল ; তা ছাড়া, আমি তখনো বিবাহ করি নি, এবং কখনো যে করব এ কথা আমার মনে স্বপ্নেও স্থান পায় নি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে চাকরি কিংবা বিবাহ করবার জন্য কোনোরূপ উৎপাত করতেন না। সুতরাং কিছু না-করবার স্বাধীনতা আমার সম্পূর্ণ ছিল। এককথায় আমি জীবনে ছুটি পেয়েছিলুম, এবং সে ছুটি আমি যত খুশি তত দীর্ঘ করতে পারতুম। তোমরা হয়তো মনে করছ যে, এরকম আরাম, এরকম সুখের অবস্থা তোমাদের কপালে ঘটলে তোমরা আর তার বদল করতে চাইতে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ অবস্থা সুখের তো নয়ই, আরামেরও ছিল না। প্রথমত, আমার শরীর তেমন ভালো ছিল না। কোনো বিশেষ অসুখ ছিল না, অথচ একটা প্রচ্ছন্ন জড়তা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র দেহটি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শরীরের ইচ্ছাশক্তি যেন দিন-দিন লোপ পেয়ে আসছিল ; প্রতি অঙ্গে আমি একটি অকারণ একটি অসাধারণ শ্রান্তি বোধ করতুম। এখন বুঝি, সে হচ্ছে কিছু না-করবার শ্রান্তি। সে যাই হোক, ডাক্তাররা আমার বুক-পিঠ ঠুকে আবিষ্কার করলেন যে, আমার যা রোগ তা শরীরের নয়, মনের। কথাটি ঠিক, তবে মনের অসুখটা যে কী তা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে ধরা অসম্ভব ছিল ; কেননা, যার মন সেই তা ঠিক ধরতে পারত না। লোকে যাকে বলে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ সংসারের ভাবনা, তা আমার ছিল না, এবং কোনো

করবে না, অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, যদিচ তখন আমার পূর্ণযৌবন তবুও কোনো বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, সে মনে কোনো অবলা সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিল না।

আমার মনে যে সুখ ছিল না, সোয়াস্তি ছিল না, তার কারণই তো এই যে, আমার মন সংসার থেকে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল। অবস্থা ঠিক তার উলটো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক অনুরাগবশতই আমার মন চার পাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই। আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা— সবই তেজোহীন শক্তিহীন ক্ষীণ রুগ্‌ণ ম্রিয়মাণ এবং মৃতকল্প। আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটি বিরাট পুতুলনাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে, আর-একটি সালংকারা পুতুলের হাত ধরে, এই পুতুলসমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হত। জানতুম, তার চাইতে মরাও শ্রেয়। কিন্তু আমি মরতে চাই নি, আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে— শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে, ফুটে উঠতে, জ্বলে উঠতে। এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীরমনকে জীর্ণ করে ফেলছিল; কেননা, এই আকাঙ্ক্ষার কোনো স্পষ্ট বিষয় ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট অবলম্বন ছিল না। তখন আমার মনের ভিতরে যা ছিল তা একটি ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সেই ব্যাকুলতা একটি কাল্পনিক একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। ভাবতুম যে, জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই আমি সজীব হয়ে উঠব। কিন্তু জানতুম, এই মরার দেশে সে জীবন্ত রমণীর সাক্ষাৎ কখনো পাব না।

এরকম মনের অবস্থায় আমার অবশ্য চার পাশের কাজকর্ম আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভালো লাগত না, তাই আমি লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয়

নাটক-নভেলের রাজ্যে বাস করতুম। এই রাজ্যের নায়কনায়িকারাই আমার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এই কাল্পনিক স্ত্রীপুরুষেরাই আমার কাছে শরীরী হয়ে উঠেছিল, আর রক্তমাংসের দেহ -ধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার চার পাশে সব ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যতই অস্বাভাবিক হোক, আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাই নি। আমার এ জ্ঞান ছিল যে, মনের এ বিকার থেকে উদ্ধার না পেলে আমি দেহমনে অমানুষ হয়ে পড়ব। সুতরাং, যাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় সে বিষয়ে আমার পুরো নজর ছিল। আমি জানতুম যে, শরীর সুস্থ রাখতে পারলে মন সময়ে আপনিই প্রকৃতিস্থ হয়ে আসবে। তাই আমি রোজ চার-পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতুম। আমার বেড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যার পর ; কোনোদিন খাবার আগে, কোনোদিন খাবার পরে। যেদিন খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরোতুম সেদিন বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যেত। এক রাত্তিরের একটি ঘটনা আমি আজও বিস্মৃত হই নি, বোধ হয় কখনো হতে পারব না ; কেননা, আজ পর্যন্ত আমার মনে তা সমান টাটকা রয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমা। আমি একলা বেড়াতে বেড়াতে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছলুম তখন রাত প্রায় এগারোটা। রাস্তায় জনমানব ছিল না, তবু আমার বাড়ি ফিরতে মন সরছিল না। কেননা, সেদিন যেরকম জ্যোৎস্না ফুটেছিল সেরকম জ্যোৎস্না কলকাতায় বোধ হয় দু-দশ বৎসরে এক-আধদিন দেখা যায়। চাঁদের আলোর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় একটা ঘুমন্ত ভাব আছে ; সে আলো মাটিতে, জলেতে, ছাদের উপর, গাছের উপর, যেখানে পড়ে সেইখানেই মনে হয় ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু সে রাত্তিরে আকাশে আলোর বান ডেকেছিল। চন্দ্রলোক হতে অসংখ্য অবিরত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন একটির পর একটি, তার পর আর-একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ পৃথিবীর উপর এসে ভেঙে পড়ছিল। এই ঢেউ-খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল, সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত

চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে এ আলোর নেশা ধরেছিল, আমি তাই নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ; মনের ভিতর একটি অস্পষ্ট আনন্দ ছাড়া আর কোনো ভাব কোনো চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ নদীর দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখি, সারি সারি জাহাজ এই আলোয় ভাসছে। জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর তা আমি পূর্বে কখনো লক্ষ্য করি নি। তাদের ওই লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতি রেখায় একটি একটানা গতির চেহারা সাকার হয়ে উঠেছিল— যে গতির মুখ অসীমের দিকে, আর যার শক্তি অদম্য এবং অপ্রতিহত। মনে হল, যেন কোনো সাগরপারের রূপকথার রাজ্যের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে এখন পাখা গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে ; এই জ্যোৎস্নার সঙ্গেসঙ্গে তারা আবার পাখা মেলে নিজের দেশে ফিরে যাবে। সে দেশ ইউরোপ, যে ইউরোপ তুমি-আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয় ; কিন্তু সেই কবিকল্পিত রাজ্য, যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। এই জাহাজের ইঙ্গিতে সেই রূপকথার রাজ্য, সেই রূপের রাজ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে এল। আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি, আকাশ জুড়ে হাজার হাজার জ্যাস্‌মিন্ হথর্‌ন্ প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়ছে, চারি দিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সে ফুল, গাছপালা সব ঢেকে ফেলেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপরে পড়েছে, রাস্তাঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। তার পর আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোনো মিরাণ্ডা কি ডেস্‌ডিমনা, বিয়াট্রিস কি টেসার দেখা পাব, এবং তার স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চিরকাঙ্ক্ষিত ইটর্নল ফেমিনিন সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন সোজা এক দিকে চলে যায়, আমি তেমনিভাবে চলতে চলতে যখন লাল রাস্তার পাশে এসে পড়লুম, তখন দেখি দূরে যেন একটি ছায়া পায়চারি করছে। আমি সেই দিকে এগোতে

লাগলুম। ক্রমে সেই ছায়া শরীরী হয়ে উঠতে লাগল ; সে যে মানুষ সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছি তখন সে পথের ধারে একটি বেঞ্চিতে বসল। আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটি ইংরেজ রমণী— পূর্ণযৌবনা, অপূর্বসুন্দরী। এমন রূপ মানুষের হয় না, সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা। আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি, সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়ল তখন দেখি, তার চোখদুটি আলোয় জ্বলজ্বল করছে। মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়— বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তড়িৎ সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর সেদিন একমুহূর্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ জড়জগৎ সেই মুহূর্তে প্রাণময় মনোময় হয়ে উঠেছিল। আমি সেদিন ঈথরের স্পন্দন চর্মচক্ষে দেখেছি ; আর দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছি যে, আমার আত্মা ঈথরের সঙ্গে একসুরে একতানে স্পন্দিত হচ্ছে। এসবই সেই রাত্তিরের সেই আলোর মায়া। এই মায়ার প্রভাবে শুধু বহির্জগতের নয়, আমার অন্তর্জগতেরও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহমন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মূর্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল, এবং সে হচ্ছে ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান বুদ্ধি এমনকি চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চেয়ে, আমি অচেতন পদার্থের মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে, একটু হাসলে। সেই হাসি দেখে আমার মনে সাহস এল, আমি সেই বেঞ্চিতে তার পাশে বসলুম— গা ঘেঁষে নয়, একটু দূরে। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলুম। বলা বাহুল্য, তখন আমি চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম ; সে স্বপ্ন যে রাজ্যের সে রাজ্যে শব্দ নেই, যা আছে তা শুধু নীরব অনুভূতি। আমি-যে স্বপ্ন দেখছিলুম

তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সে সময় আমার কাছে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কলকাতা শহরে কোনো বাঙালি রোমিয়োর ভাগ্যে কোনো বিলাতি জুলিয়েট যে জুটতে পারে না, এ জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল যে, এ স্ত্রীলোকেরও হয়তো আমারই মত মনে সুখ ছিল না, এবং সে একই কারণে। এর মনও হয়তো এর চার পাশের বণিক-সমাজ হতে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল, এবং এও সেই অপরিচিতের আশায় প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন বিষাদে অবসাদে কাটাচ্ছিল, যার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে এর জীবন-মন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর আজকের এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব সৌন্দর্যের ডাকে আমরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের এ মিলনের মধ্যে বিধাতার হাত আছে। অনাদিকালে এ মিলনের সূচনা হয়েছিল, এবং অনন্তকালেও তার সমাধা হবে না। এই সত্য আবিষ্কার করবামাত্র আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে; একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনো দেখি নি। সে চাহনিতে আমার হৃদয়-মন একেবারে গলে উথলে উঠল; আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম। সে হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।

হঠাৎ সে তার হাত আমার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি, সে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে সে দক্ষিণ দিকে দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করলে। আমি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, ছ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা

একটি ইংরেজ চার-পাঁচজন চাকর সঙ্গে করে মেয়েটির দিকে জোরে হেঁটে চলছে। মেয়েটি দু পা এগোচ্ছে, আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে, আবার এগোচ্ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। এমনি করতে করতে ইংরেজটি যখন তার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হল, অমনি সে দৌড়তে আরম্ভ করলে। পিছনে পিছনে এরা সকলেও দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটি চীৎকার শুনতে পেলুম। সে চীৎকারধ্বনি যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বিকট। সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল; আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম, আমার নড়বার-চড়বার শক্তি রইল না। তার পর দেখি চার-পাঁচজনে চেপে ধরে তাকে আমার দিকে টেনে আনছে, ইংরেজটি সঙ্গেসঙ্গে আসছে। মনে হল, এ অত্যাচারের হাত থেকে একে উদ্ধার করতেই হবে, এই পশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে। এই মনে করে আমি যেমন সেই দিকে এগোতে যাচ্ছি অমনি মেয়েটি হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলে। সেই অট্টহাস্য চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে হাসি তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশি বিকট, দশগুণ বেশি মর্মভেদী। আমি বুঝলুম যে, মেয়েটি পাগল, একেবারে উন্মাদ পাগল; পাগলা-গারদ থেকে কোনো সুযোগে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই আমার প্রথম ভালোবাসা, আর এই আমার শেষ ভালোবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের মত কোমল কত তারার মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি, ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্টও হয়েছি; কিন্তু যে মুহূর্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে সেই মুহূর্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেই দিন থেকে চিরদিনের জন্য ইটর্নল ফেমিনিন্‌কে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

এই বলে সেন তাঁর কথা শেষ করলেন। আমরা সকলে চুপ করে

রইলুম। এতক্ষণ সীতেশ চোখ বুজে একখানি আরামচৌকির উপর তাঁর ছ-ফুট দেহটি বিস্তার করে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিলেন ; তাঁর হস্তচ্যুত আধ-হাত লম্বা ম্যানিলা চুরুটটি মেজের উপর পড়ে সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছিল। আমি মনে করেছিলুম, সীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ জলের ভিতর থেকে একটা বড়মাছ যেমন ঘাই মেরে ওঠে, তেমনি সীতেশ এই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসলেন। সেদিনকার সেই রাত্তিরের ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে-গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্তির মত দেখাচ্ছিল। তার পর সেই মূর্তি অতি মিহি মেয়েলি গলায় কথা কইতে আরম্ভ করলেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কিংকর্তব্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সীতেশের কথা ঠিক তার পুনরাবৃত্তি নয়।

সীতেশের কথা

তোমরা সকলেই জান, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উলটো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে আমি তার একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার করে নূতন করে ভালোবাসায় পড়তুম। তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ, এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বলতে তা ঠিক। আমি যে সেকালে দিনে একবার করে ভালোবাসায় পড়ি নি এতেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন-একটি শক্তি আছে যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি কারও-বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারও-বা মুখের হাসিতে, কারও-বা গলার স্বরে, কারও-বা দেহের গঠনে। এমনকি, শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের

রঙে গহনার ঝংকারেও, আমার বিশ্বাস, জাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়ি; সেদিন সে ফল্‌সাই রঙের কাপড় পরেছিল। তার পরে তাকে আর-একদিন আশমানি রঙের কাপড়-পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারে নি। আজও আমি মলের শব্দ শুনলে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোনো বন্ধ গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সে দিকে যায়; গ্রীক স্ট্যাচুর মত গড়নের কোনো হিন্দুস্থানি রমণীকে পথে-ঘাটে পিছন থেকে দেখলে আমি ঘাড় বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া, সেকালে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেই জাতের পুরুষমানুষ যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অনুরক্ত হয়। এ সত্ত্বেও যে আমি নিজের কিংবা পরের সর্বনাশ করি নি তার কারণ, ডন জুয়ান হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই, কখনো ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাঁচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে— অর্থাৎ, তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না— আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা কাঁচও ভাঙি নি তার কারণ, ও-বস্তু ভাঙলে প্রথমত বড় আওয়াজ হয়— তার ঝন্‌ঝনানি পাড়া মাথায় করে তোলে; দ্বিতীয়ত তাতে হাত-পা কাটবার ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন ইটর্নল ফেমিনিন একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন, আর আমি অনেকের ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পান নি, আমিও পাই নি। তবে দুজনের ভিতর তফাত এই যে, সেনের মত কঠিন মন কোনো স্ত্রীলোকের হাতে পড়লে সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম খুদে রেখে যায়; কিন্তু আমার মত তরল মনে স্ত্রীলোক-মাত্রেই তার আঙুল ডুবিয়ে যা-খুশি হিজিবিজি করে দাঁড়ি টানতে পারে, সেইসঙ্গে সে মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করেও তুলতে পারে, কিন্তু কোনো দাগ রেখে যেতে পারে না। সে অঙ্গুলিও সরে যায়, তার রেখাও মিলিয়ে যায়। তাই আজ দেখতে পাই, আমার স্মৃতিপটে

একটি ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুলতে পারি নি, কেননা এক জীবনে এমন ঘটনা দু বার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধ হয় অক্টোবরের শেষ, কিংবা নভেম্বরের প্রথম। কেননা, এইটুকু মনে আছে যে, তখন চিমনিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে সন্ধে হয়েছে— যেন সূর্যের আলো নিবে গেছে, অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয় নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলের মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ-স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যাঁরা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে, হন্‌হন্ করে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডান হাতে ছাতা ধরে বাঁ হাতে গাউন হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরে কাদাখোঁচার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক। এই থেকে আন্দাজ করলুম, বৃষ্টি শুরু হয়েছে; কেননা, এ বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে তা কানে শোনা যায় না।

ভালো কথা, এ জিনিস কখনো নজর করে দেখেছ কি যে, বর্ষার দিনে বিলেতে কখনো মেঘ করে না? আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায়, এবং তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট সব কাদায় প্যাচ-প্যাচ করে। মনে হয় যে, এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে, আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য নোংরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মনমরা হয়ে গেলুম সে কথা বলা বাহুল্য। এরকম দিনে, ইংরেজরা বলেন, তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

আমার একজনের সঙ্গে রিচমণ্ডে যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দিনে ঘর থেকে বেরোবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে টাইম্‌স্ নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও-কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত পড়লুম; এক কথাও বাদ দিই নি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, টাইম্‌সের শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশি মুখরোচক। তার আর্টিকেল্ পড়লে মনে যা হয় তার নাম রাগ; আর তার অ্যাড্‌ভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে যা হয় তার নাম লোভ; সে যাই হোক, কাগজ-পড়া শেষ হতে-না-হতেই দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসে ছিলুম সেইখানে বসেই তা শেষ করলুম। তখন ছুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনো বদল হয় নি, কেননা, এই বিলেতি বৃষ্টি ভালো করে পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না। তফাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে, বাতি না জ্বেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার জো নেই।

আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে শুরু করলুম। খানিকক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে এল। ঘরের গ্যাস জ্বেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই— অ্যান্‌সন্ -এর কনট্র্যাক্ট। এক কথা দশ বার করে পড়লুম, অথচ অফার এবং অ্যাক্‌সেপ্টেন্স -এর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এতে রাজি? তুমি উত্তর করলে, আমি ওতে রাজি!— এই সোজা জিনিসটেকে মানুষ কি জটিল করে তুলেছে তা দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লুম। মানুষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখত তা হলে এইসব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তাঁর খুরে দণ্ডবৎ করে অ্যান্‌সন্‌কে শেল্‌ফের সর্বোচ্চ থাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল, সুমুখে একখানা পুরোনো পাঞ্চ্ পড়ে রয়েছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন পাঞ্চ্ পড়ে হাসি পাওয়া দূরে থাক্, রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরি

রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে এই ভেবে অবাক হলুম। দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম যে, পৃথিবীর এমন দিনও আসবে যখন 'মেড ইন জর্মনি' এই ছাপ-মারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে, এ দেশের আকাশের মত এ দেশের মনেও বিদ্যুৎ কালেভদ্রে এক-আধ বার দেখা দেয়— তাও আবার যেমন ফ্যাকাশে, তেমনি এলো। যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি পাঞ্চ্‌খানি চিমনির ভিতর গুঁজে দিলুম, তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড়পদার্থ পাঞ্চ্‌-এর মান রাখল দেখে খুশি হলুম। তার পর চিমনির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তার পর আবার একখানি বই নিয়ে পড়তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের উপর সারি সারি রুপোর বাতিদান, গাদা গাদা রুপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মত পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে কাঁচের গেলাস। আর সেইসব গেলাসের ভিতর স্পেনের ফ্রান্সের জর্মনির মদ— তার কোনোটির রঙ চুনির, কোনোটির পান্নার, কোনোটির পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম অ্যাল্‌গার্নন, নায়িকার মিলিসেন্ট। একজন ডিউকের ছেলে, আর একজন মিলিয়নেয়ারের মেয়ে; রূপে অ্যাল্‌গার্নন বিদ্যাধর, মিলিসেন্ট বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন, এবং সে প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে অ্যাল্‌-গার্নন বিবাহের অফার করবেন, মিলিসেন্ট তা অ্যাক্‌সেপ্ট করবেন— কনট্র্যাক্ট পাকা হয়ে যাবে।

সেকালে কোনো বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘে চড়ে অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াশায় ভর করে এই নভেল-বর্ণিত রুপোর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম, সেখানে একটি যুবতী বিরহিণী যক্ষপত্নীর মত আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরে-মানিক দিয়ে সাজানো সোনার

প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে, চার চক্ষুর মিলন হবামাত্রই আমার মনে ভালোবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তাঁর হাতে সমর্পণ করলুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ করলে। ফলে যা পেলুম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেইসঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময় ঘড়িতে টংটং করে চারটে বাজল, অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকার জলকাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানই তো, জলই হোক ঝড়ই হোক লণ্ডনের রাস্তায় লোকচলাচল কখনো বন্ধ হয় না, সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি শুধু মানুষের স্রোত চলেছে— সকলেরই পরনে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখতে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য ডাগেরোটাইপের ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর ঘরের চাইতে আমার বেশি একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি; অথচ সেই মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক তা এইরকম দিনে এইরকম অবস্থায় পুরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি হবর্ন সার্কাসের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। সুমুখে দেখি, একটি ছোট পুরোনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নীচে বসে আছে। তার গায়ের ফ্রক্‌কোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়েসকালে কালো ছিল, এখন তা হলদে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটি শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে

উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে, আমার মত শৌখিন পোশাক পরা খদ্দের ইতিপূর্বে তার দোকানের ছায়া কখনোই মাড়ায় নি। এ-বই ও-বই সে-বইয়ের ধুলো ঝেড়ে সে আমার সুমুখে নিয়ে এসে ধরতে লাগল। আমি তাকে স্থির থাকতে ব'লে নিজেই এখান থেকে সেখান থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করলুম। কোনো বইয়ের-বা পাঁচ মিনিট ধরে ছবি দেখলুম, কোনো বইয়ের-বা দু-চার লাইন পড়েও ফেললুম। পুরোনো বই ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে তা তোমরা সবাই জান। আমি একমনে সেই আনন্দ উপভোগ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি জানি কোথা থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মত ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ। এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা ক'রে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেননা, ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়; তার কোনো মুখ নেই। কিন্তু এ সেইজাতীয় গন্ধ যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম, এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরীর, নয় পাচুলির— অর্থাৎ, রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড় পরা একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছি দেখে সে চোখ ফেরালে না। পূর্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেরকম করে হাসে সেইরকম মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল, অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি যে, এ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিন্‌কালেও দেখা হয় নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার এক ছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ-দুটি যেন

ছুরির মত আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অসোয়াস্তি করতে লাগল যে, আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি, সেই মুখ-টেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়— চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিকমিক করছে। আমি সে দৃষ্টি এড়াবার যতবার চেষ্টা করলুম, আমার চোখ ততবার ফিরে ফিরে সেই দিকেই গেল। শুনতে পাই, কোনো কোনো সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে যার টানে গাছের পাখি মাটিতে নেমে আসে— হাজার পাখা-ঝাপটা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখির মতই হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল; ওই পাচুলির গন্ধ, আর ওই চোখের আলো, এই দুইয়ে মিশে আমার শরীর-মন দুইই উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না, সুতরাং, তখন যে কি করছিলুম তা আমি জানি নে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ের ধাক্কা লাগল; আমি মাপ চাইলুম। সে হাসিমুখে উত্তর করলে, আমার দোষ, তোমার নয়। তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল; কেননা, সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ করলুম যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু। আমি তাকে এ বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি তা পড়েছি কি না। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানি নে। তার কথা-বার্তায় বুঝলুম যে, তার পড়াশুনো আমার চাইতে ঢের বেশি। জর্মান ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান তিন ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম, তাই নিজের বিদ্যে দেখাবার জন্যে একখানি ফরাসি কেতাব তুলে নিয়ে ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে

লাগল আমি কি পড়ছি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল। কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর-মনে আগুন ধরিয়ে দিলে।

ফরাসি বইখানির যা পড়ছিলুম তা হচ্ছে একটি কবিতা—

Si vous n'avez rien à me dire
Pourquoi venir auprès de moi?
Pourquoi me faire ce sourire
Qui tournerait la tête au roi?

এর মোটামুটি অর্থ এই : যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে তো আমার কাছে এলেই-বা কেন, আর অমন করে হাসলেই-বা কেন, যাতে রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়।

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক্ করে হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপটা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলুম। আমার পড়া আর এগোল না। ছোট ছেলেতে যেমন কোনো অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়লে শুধু হেলে-দোলে বেঁকে-চোরে, অপ্রতিভভাবে এদিক-ওদিক চায়, আর কোনো কথা বলতে পারে না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে, এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে একটি মরক্কোর পকেট-কেস বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি; একটিও শিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথাও একটি শিলিং পেলুম না। এই সময়ে আমার নবপরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বললে, তোমার আর গিনি ভাঙাতে হবে না, ও বইখানি আমি নেব। আমি বললুম, তা হবে না। তাতে সে হেসে বললে, আজ থাক্, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিন তুমি টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

এর পরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসে আমার

660.dt 17.9.57 National Library

সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে, এখন তোমার বিশেষ করে কোথাও যাবার আছে?

আমি বললুম, না।

তবে চলো, অক্সফোর্ড সার্কাস পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চলতে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

তার কারণ, পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনো মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপযৌবন থাকে, তা হলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচ শ জন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশ জন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচ জন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আর অন্তত একজন এসে বলবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই যদি আমাদের স্বভাব হয় তো কী ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমাকে আমি ভয় করি নে।

কেন?

বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে যারা আমাদের রক্ষক।

সে জাতটি কী?

যদি রাগ না কর তো বলি। কারণ, কথাটা সত্য হলেও, প্রিয় নয়।

তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার, কেননা, তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সে হচ্ছে পোষা কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে

আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর, অপর-কোনো পুরুষকে আমাদের কাছে আঁসতে দেয় না। বাইরের লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তার পর দাঁত বার করে ; তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয় তা হলে তাকে কামড়ায়।

আমি কি উত্তর করব ভেবে না পেয়ে বললুম, তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশি।

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে, ভক্তি না থাক্ ভালোবাসা আছে।

আমার মনে হল, তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা অক্সফোর্ড সার্কাসের দিকে চলেছিলুম, কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারি নি ; কেননা, দু জনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ কথাগুলি শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পর যা জিজ্ঞেস করলুম তার থেকে বুঝতে পারবে যে, তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি। তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে ?

কখনোই না।

এই-যে একটু আগে বললে যে আবার যেদিন দেখা হবে—

সে তুমি শিলিংটে নিতে ইতস্তত করছিলে বলে।

এই বলে সে আমার দিকে চাইলে। দেখি, তার মুখে সেই হাসি, যে হাসির অর্থ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি।

আমি তখন নিশিতে-পাওয়া লোকের মত জ্ঞানহারা হয়ে চলছিলুম। তার সকল কথা আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢুকছিল না। তাই আমি তার হাসির উত্তরে বললুম, তুমি না চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।

কেন ? আমার সঙ্গে তোমার কোনো কাজ আছে ?

শুধু দেখা-করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আসল কথা এই যে, তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারব না।

এ কথা যে বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেল ?

পরের বই থেকে বলছি নে, নিজের মন থেকে। যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য।

তোমার বয়সের লোক নিজের মন জানে না। মনের সত্য-মিথ্যা চিনতেও সময় লাগে। ছোটছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালোবাসা হয়। ওসব হচ্ছে যৌবনের দুষ্টু খিধে।

তুমি যা বলছ তা হয়তো সত্য। কিন্তু আমি জানি যে, তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে।

ও হচ্ছে যৌবনের সীজ্‌ন্‌ ফ্লাওয়ার, দু দণ্ডেই ঝরে যায় ; ও ফুলে কোনো ফল ধরে না।

যদি তাই হয়, তো, যে ফুল তুমি ফুটিয়েছ তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছ কেন। ওর প্রাণ দু দণ্ডের কি চিরদিনের, তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যৎই দিতে পারে

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে বললে, তুমি কি ভাবছ যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু-পিছু চিরকাল চলতে পারবে ?

আমার বিশ্বাস, পারব।

আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে ?

তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি যদি আলেয়া হই ! তা হলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে !

আমার মনে এ কথার কোনো উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বললে, তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে, আমি বুঝতে পারছি তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনের কথাই বলছ। সেইজন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাই নে।

তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি, সে কষ্ট আমি তোমাকে দিতে চাই নে। প্রথমত তুমি বিদেশি, তার পর তুমি নিতান্ত অর্বাচীন।

এতক্ষণে আমরা অক্সফোর্ড সার্কাসে এসে পৌঁছলুম। আমি একটু উত্তেজিতভাবে বললুম, আমি নিজের মন দিয়ে জানছি যে, তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশি কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও তা হলে বলো, আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

সম্ভবত আমার কথার ভিতর এমন-একটা কাতরতা ছিল যা তার মনকে স্পর্শ করলে। তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে, তার মনে আমার প্রতি একটু মায়া জন্মেছে।

সে বললে, আচ্ছা, তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আমি অমনি আমার পকেট-কেস থেকে একখানি কার্ড বার করে তার হাতে দিলুম। তার পর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে, সঙ্গে নেই। আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পিড়াপিড়ি করলুম, সে কিছুতেই বলতে রাজি হল না।

শেষটা অনেক কাকুতিমিনতি করবার পর বললে, তোমার একখানি কার্ড দাও, তার গায়ে লিখে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার কথা দিতে হবে, সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখবে না।

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য ধরে থাকতে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেসটি আমার হাত থেকে নিয়ে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, একখানি কার্ড বার করে তার উপর পেনসিল দিয়ে কি লিখে, আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে, কেসটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই, পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর লাফিয়ে উঠে, সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বললে। দেখতে-না-দেখতে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি রিজেন্ট স্ট্রীটে ঢুকে, প্রথম যে রেস্তরাঁ চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে এক

পাইন্ট শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে লাগলুম। দশ মিনিট দশ ঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছটা বাজা অমনি আমি পকেট-কেস খুলে যা দেখলুম তাতে আমার ভালোবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে গেল। দেখি, কার্ডখানি রয়েছে, গিনি-ক'টি নেই। কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই-ক'টি কথা লেখা ছিল : পুরুষমানুষের ভালোবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনো খোঁজ না কর তা হলে যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করি নি, পুলিশ দিয়েও করাই নি। শুনে আশ্চর্য হবে, সেদিন আমার মনে রাগ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল ; তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

সোমনাথ এতক্ষণ, যেমন তাঁর অভ্যাস, একটির পর আর-একটি সিগারেট অনবরত খেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের সুমুখে ধোঁয়ার একটি ছোটখাটো মেঘ জমে গিয়েছিল। তিনি একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে ছিলেন, এমনভাবে যেন সেই ধোঁয়ার ভিতর তিনি কোনো নূতন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। পূর্বপরিচয়ে আমাদের জানা ছিল যে, সোমনাথকে যখন সবচেয়ে অন্যমনস্ক দেখায় ঠিক তখনই তাঁর মন সব-চেয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকে ; সে সময়ে একটি কথাও তাঁর কান এড়িয়ে যায় না, একটি জিনিসও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। সোমনাথের চাঁচা-ছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির ডায়ালের মত, অর্থাৎ, তার ভিতরকার কলটি যখন পুরোদমে চলছে তখনো সে মুখের তিলমাত্র বদল হত না, তার একটি রেখাও বিকৃত হত না। তাঁর এই আত্মসংযমের ভিতর অবশ্য আর্ট ছিল। সীতেশ তাঁর কথা শেষ করতে-না-করতেই সোমনাথ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমরা বুঝলুম, সোমনাথ তাঁর মনের ধনুকে ছিলে চড়ালেন, এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে। আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা

করতে হল না। তিনি ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে বদলি করে দিয়ে, অতি মোলায়েম অথচ অতি দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ করলেন। লোকে যেমন করে গানের গলা তৈরি করে, সোমনাথ তেমনি করে কথার গলা তৈরি করেছিলেন; সে কণ্ঠস্বরে কর্কশতা কিংবা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে তাঁর মুখের কথার প্রতি অক্ষর গুনে নেওয়া যেত। আমাদের এ বন্ধুটি সহজ মানুষের মত সহজভাবে কথাবার্তা কইবার অভ্যাস অতি অল্পবয়সেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গোঁফ না উঠতেই চুল পেকেছিল। তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন। তাঁর অল্প কথা তিনি বলতেন শানিয়ে, আর বেশি কথা সাজিয়ে। সোমনাথের ভাবগতিক দেখে আমরা একটি লম্বা বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম। অমনি আমাদের চোখ সোমনাথের মুখ থেকে নেমে তাঁর হাতের উপর গিয়ে পড়ল। আমরা জানতুম যে, তিনি তাঁর আঙুল-ক'টিকেও তাঁর কথার সংগত করতে শিখিয়েছিলেন।

সোমনাথের কথা

তোমরা আমাকে বরাবর ফিলজফার বলে ঠাট্টা করে এসেছ, আমিও অদ্যাবধি সে অপবাদ বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নিয়েছি। রমণী যদি কবিত্বের একমাত্র আধার হয়, আর যে কবি নয় সেই যদি ফিলজফার হয়, তা হলে আমি অবশ্য ফিলজফার হয়েই জন্মগ্রহণ করি। কি কৈশোরে কি যৌবনে স্ত্রীজাতির প্রতি আমার মনের কোনোরূপ টান ছিল না। ও-জাতি আমার মন কিংবা ইন্দ্রিয় কোনোটিই স্পর্শ করতে পারত না। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন নরমও হত না, শক্তও হত না। আমি ও-জাতীয় জীবদের ভালোও বাসতুম না, ভয়ও করতুম না; এককথায়, ওদের সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান আমাকে পৃথিবীতে আর যে কাজের

জন্যই পাঠান, নায়িকা-সাধন করবার জন্য পাঠান নি। কিন্তু নারীর প্রভাব যে সাধারণ লোকের মনের উপর কত বেশি কত বিস্তৃত আর কত স্থায়ী, সে বিষয়ে আমার চোখ কান দু-ই সমান খোলা ছিল। দুনিয়ার লোকের এই স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে ছোটাটা আমার কাছে যেমন লজ্জাকর মনে হত, দুনিয়ার কাব্যের নারীপূজাটাও আমার কাছে তেমনি হাস্যকর মনে হত। যে প্রবৃত্তি পশুপক্ষী-গাছপালা ইত্যাদি প্রাণীমাত্রেরই আছে সেই প্রবৃত্তিটিকে যদি কবিরা সুরে জড়িয়ে, উপমায় সাজিয়ে, ছন্দে নাচিয়ে তার মোহিনী শক্তিকে এত বাড়িয়ে না তুলতেন তা হলে মানুষে তার এত দাস হয়ে পড়ত না। নিজের হাতে-গড়া দেবতার পায়ে মানুষে যখন মাথা ঠেকায় তখন অভক্ত দর্শকের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। এই ইটর্নল ফেমিনিনের উপাসনাই তো মানুষের জীবনকে একটা ট্র্যাজি-কমেডি করে তুলেছে। একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল, এ কথা অবশ্য তোমরা কখনো স্বীকার কর নি। তোমাদের মতে, যে জ্ঞান পশুপক্ষী-গাছপালার ভিতর নেই, শুধু মানুষের মনে আছে— অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞান— তাই হচ্ছে এ পূজার যথার্থ মূল। এবং জ্ঞান জিনিসটে অবশ্য মনের ধর্ম, শরীরের নয়। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কখনো একমত হতে পারি নি ; তার কারণ, রূপ সম্বন্ধে হয় আমি অন্ধ ছিলুম, নয় তোমরা অন্ধ ছিলে।

আমার ধারণা, প্রকৃতির হাতে-গড়া, কি জড় কি প্রাণী, কোনো পদার্থেরই যথার্থ রূপ নেই। প্রকৃতি যে কত বড় কারিকর, তাঁর সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ড থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী, এমনকি উল্কা পর্যন্ত, সব এক ছাঁচে ঢালা, সব গোলাকার— তাও আবার পুরোপুরি গোল নয়, সবই ঈষৎ তেড়া-বাঁকা, এখানে ওখানে চাপা ও চ্যাপ্টা। এ পৃথিবীতে যা-কিছু সর্বাঙ্গসুন্দর তা মানুষের হাতেই গড়ে উঠেছে। এথেন্সের পার্থেনন থেকে আগ্রার তাজমহল পর্যন্ত এই সত্যেরই পরিচয় দেয়। কবিরা বলে থাকেন যে, বিধাতা তাঁদের প্রিয়াদের

নির্জনে বসে নির্মাণ করেন। কিন্তু বিধাতা-কর্তৃক এই নির্জনে-নির্মিত কোনো প্রিয়াই রূপে গ্রীক শিল্পীর বাটালিতে-কাটা পাষাণমূর্তির সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল বলে কোনো মর্তনারীর রূপ দেখে আমার অন্তরে কখনো হৃদ্‌রোগ জন্মায় নি। এ স্বভাব, এ বুদ্ধি নিয়েও আমি জীবনের পথে ইটর্নল ফেমিনিন্‌কে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। আমি তাঁকে খুঁজি নি— একেও নয়, অনেকেও নয়— কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁর হাতে আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে, স্ত্রীপুরুষের এই ভালোবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে তা হচ্ছে একটি বিরাট রহস্য— ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাংলা অর্থেও বটে— অর্থাৎ, ভালোবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke।

একবার লণ্ডনে আমি মাসখানেক ধরে ভয়ানক অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন ইল্‌ফ্রাকোম্ব্‌ যেতে। শুনলুম, ইংলণ্ডের পশ্চিম-সমুদ্রের হাওয়া লোকের চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দেয়, চুলের ভিতর বিলি কেটে দেয়। সে হাওয়ার স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন, ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেইদিনই ইল্‌ফ্রাকোম্ব্‌ যাত্রা করলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনের একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।

আমি যে হোটেলে গিয়ে উঠি সেটি ইল্‌ফ্রাকোম্বের সব-চাইতে বড়, সব-চাইতে শৌখিন হোটেল। সাহেব-মেমের ভিড়ে সেখানে নড়বার জায়গা ছিল না, পা বাড়ালেই কারও-না-কারও পা মাড়িয়ে দিতে হত। এ অবস্থায় আমি দিনটে বাইরেই কাটাতুম। তাতে আমার কোনো দুঃখ ছিল না, কেননা, তখন বসন্তকাল। প্রাণের স্পর্শে জড়জগৎ যেন হঠাৎ শিহরিত পুলকিত উদ্বেজিত হয়ে উঠেছিল। এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ও সৌন্দর্যের কোনো সীমা ছিল না। মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হিরেকসের সমুদ্র, আর ডাইনে-বাঁয়ে শুধু ফুলের জহরত খচিত

গাছপালা— সে পুষ্পরত্নের কোনোটি-বা সাদা, কোনোটি-বা লাল, কোনোটি-বা গোলাপি, কোনোটি-বা বেগুনি। বিলেতে দেখেছি, বসন্তের রঙ শুধু জল-স্থল-আকাশের নয়, বাতাসের গায়েও ধরে। প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্ঠবের রেখার সুষমার যে অভাব আছে, তা সে এই রঙের বাহারে পুষিয়ে নেয়। এই খোলা আকাশের মধ্যে এই রঙিন প্রকৃতির সঙ্গে আমি দুদিনেই ভাব করে নিলুম। তার সঙ্গই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, মুহূর্তের জন্য কোনো মানবসঙ্গীর অভাব বোধ করি নি। তিন-চার দিন বোধ হয় আমি কোনো মানুষের সঙ্গে একটি কথাও কই নি। কেননা, সেখানে আমি জনপ্রাণীকেও চিনতুম না; আর, কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করা আমার ধাতে ছিল না।

তার পর একদিন রাত্তিরে ডিনার খেতে যাচ্ছি, এমন সময় বারাণ্ডায় কে একজন আমাকে গুড ইভনিং বলে সম্বোধন করলে। আমি তাকিয়ে দেখি, সুমুখে একটি ভদ্রমহিলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, তার উপর তিনি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। সেই-সঙ্গে নজরে পড়ল যে, তাঁর পরনে চকচকে কালো সাটিনের পোশাক, আর আঙুলে রঙবেরঙের নানা আকারের পাথরের আংটি। বুঝলুম যে, এঁর আর যে বস্তুরই অভাব থাক্, পয়সার অভাব নেই। ছোটলোকি বড়মানুষির এমন চোখে-আঙুল-দেওয়া চেহারা বিলেতে বড়-একটা দেখা যায় না। তিনি দু কথায় আমার পরিচয় নিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে অনুরোধ করলেন, আমি ভদ্রতার খাতিরে স্বীকৃত হলুম।

আমরা খানা-কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী গজেন্দ্রগমনে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম, কেননা, হাতে-বহরে স্ত্রীজাতির এ-হেন নমুনা সে দেশেও অতিবিরল। মাথায় তিনি সীতেশের সমান উঁচু, শুধু বর্ণে সীতেশ যেমন শ্যাম, তিনি তেমনি শ্বেত— সে সাদার ভিতরে অন্য কোনো রঙের চিহ্নও ছিল না— না গালে, না ঠোঁটে, না চুলে,

না ভুরুতে। তাঁর পরনের সাদা কাপড়ের সঙ্গে তাঁর চামড়ার কোনো তফাত করবার জো ছিল না। এই চুনকাম-করা মূর্তিটির গলায় যে একটি মোটা সোনার শিকলি হার আর দু হাতে তদনুরূপ চেন-ব্রেসলেট ছিল, আমার চোখ ঈষৎ ইতস্তত করে তার উপরে গিয়েই বসে পড়ল। মনে হল যেন ব্রহ্মদেশের কোনো রাজ-অন্তঃপুর থেকে একটি শ্বেতহস্তিনী তার স্বর্ণশৃঙ্খল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে। আমি এই ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে, তাঁর অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠতে ভুলে গিয়ে, যেমন বসে ছিলুম তেমনি বসে রইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে হল না। আমার নবপরিচিতা প্রৌঢ়া সঙ্গিনীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে, সেই রক্তমাংসের মনুমেন্টের সঙ্গে এই বলে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—

আমার কন্যা মিস্ হিল্‌ডেস্‌হাইমর। মিস্টার—?

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মিস্টার গ্যাঁগো— গ্যাঁগো— গ্যাঁগো—

আমার নামের উচ্চারণ ওর চাইতে আর বেশি এগোল না। আমি শ্রীমতীর করমর্দন করে বসে পড়লুম। একতাল জেলির উপর হাত পড়লে গা যেমন করে ওঠে আমার তেমনি করতে লাগল। তার পর ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন, মিস্ চুপ করেই রইলেন। তাঁর কথা বন্ধ ছিল বলে যে তাঁর মুখ বন্ধ ছিল, অবশ্য তা নয়। চর্বণ চোষণ লেহন পান প্রভৃতি দন্ত ওষ্ঠ রসনা কণ্ঠ তালুর আসল কাজ সব সজোরেই চলছিল। মাছ মাংস ফল মিষ্টান্ন, সব জিনিসেই দেখি তাঁর সমান রুচি। যে বিষয়ে আলাপ শুরু হল তাতে যোগদান করবার, আশা করি, তাঁর অধিকার ছিল না।

এই অবসরে আমি যুবতিটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলুম। তাঁর মত বড় চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না— সে চোখ যেমন বড় তেমনি জ'লো, যেমন নিশ্চল তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালোবাসায় পড়ে যেত, আর সেন কবিতা লিখতে

বসত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল তরল করুণ প্রশান্ত। তোমরা এরকম চোখে মায়া মমতা স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কত-কি মনের ভাব দেখতে পাও। কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই সে হচ্ছে, পোষা জানোয়ারের ভাব; গোরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ —তাতে অন্তরের দীপ্তিও নেই, প্রাণের স্ফূর্তিও নেই। এঁর পাশে বসে আমার সমস্ত শরীরের ভিতরে যে অসোয়াস্তি করছিল, তাঁর মার কথা শুনে আমার মনের ভিতর তার চাইতেও বেশি অসোয়াস্তি করতে লাগল। জান, তিনি আমাকে কেন পাকড়াও করেছিলেন?— সংস্কৃত শাস্ত্র ও বেদান্তদর্শন আলোচনা করবার জন্য। আমার অপরাধের মধ্যে, আমি যে সংস্কৃত খুব কম জানি, আর বেদান্তের বে দূরে থাক্, আলেফ পর্যন্ত জানি নে, এ কথা একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। ফলে, তিনি যখন আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন তখন আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করলুম। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ শ্রুতি কি না, গীতার ব্রহ্মনির্বাণ ও বৌদ্ধনির্বাণ এ-তুই এক জিনিস কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নিতান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এসব বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত-সমাজে যে বহু এবং বিষম মতভেদ আছে, আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার বার সেই কথাটাই বলছিলুম। আমি যে কি মুশকিলে পড়েছি তা আমার প্রশ্নকর্ত্রী বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমার পাশের টেবিলের একটি রমণী তা বিলক্ষণ বুঝছিলেন।

সে টেবিলে এই স্ত্রীলোকটি একটি জাঁদরেলি-চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন। সে ভদ্রলোকের মুখের রঙ এত লাল যে দেখলে মনে হয়, কে যেন তার সন্ত ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। পুরুষটি যা বলছিলেন সেসব কথা তাঁর গোঁফেই আটকে যাচ্ছিল, আমাদের কানে পৌঁছচ্ছিল না। তাঁর সঙ্গিনীও তা কানে তুলছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেননা, স্ত্রীলোকটি যদিচ আমাদের দিকে একবারও মুখ ফেরান নি, তবু তাঁর মুখের ভাব থেকে বোঝা

যাচ্ছিল যে, তিনি আমাদের কথাই কান পেতে শুনছিলেন। যখন আমি কোনো প্রশ্ন শুনে কি উত্তর দেব ভাবছি, তখন দেখি, তিনি আহার বন্ধ করে তাঁর সুমুখের প্লেটের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রয়েছেন। আর, যেই আমি একটু গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছি তখনি দেখি, তাঁর চোখের কোণে একটু সকৌতুক হাসি দেখা দিচ্ছে। আসলে আমাদের এই আলোচনা শুনে তাঁর খুব মজা লাগছিল। কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলুম, এই ডিনার-ভোগ-রূপ কর্মভোগ থেকে কখন উদ্ধার পাব। অতঃপর যখন টেবিল ছেড়ে সকলেই উঠলেন, সেইসঙ্গে আমিও উঠে পালাবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে এই বিলাতি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আমাকে বললেন, তোমার সঙ্গে হিন্দুদর্শনের আলোচনা করে আমি এত আনন্দ আর এত শিক্ষা লাভ করেছি যে, তোমাকে আর আমি ছাড়ছি নে ; জান, উপনিষদ্‌ই হচ্ছে আমার মনের ওষুধ ও পথ্য। আমি মনে মনে বললুম, তোমার যে কোনো ওষুধ-পথ্যির দরকার আছে তা তো তোমার চেহারা দেখে মনে হয় না। সে যাই হোক, তোমার যত খুশি তুমি তত জর্মনির ল্যাবরেটরিতে তৈরি বেদান্ত-ভস্ম সেবন কর, কিন্তু আমাকে যে কেন তার অনুপান জোগাতে হবে তা বুঝতে পারছি নে। তাঁর মুখ চলতেই লাগল। তিনি বললেন, আমি জর্মনিতে ডয়্‌সেন-এর কাছে বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু তুমি যত পণ্ডিতের নাম জান ও যত বিভিন্ন মতের সন্ধান জান, আমার গুরু তার শিকির শিকিও জানেন না। বেদান্ত পড়া তো চিন্তারাজ্যের হিমালয়ে চড়া, শংকর তো জ্ঞানের গৌরীশংকর। সেখানে কি শান্তি, কি শৈত্য, কি শুভ্রতা, কি উচ্চতা। মনে করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুদর্শন যে যেমন উচ্চ তেমনি বিস্তৃত, এ কথা আমি জানতুম না। চলো, তোমার কাছ থেকে আমি এইসব অচেনা পণ্ডিত অজানা বইয়ের নাম লিখে নেব।

এ কথা শুনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হল, কেননা শাস্ত্রে বলে, মিথ্যে কথা শতং বদ মা লিখ। বলা বাহুল্য যে, আমি যত বইয়ের নাম করি

তার একটিও নেই, আর যত পণ্ডিতের নাম করি তাঁরা সবাই সশরীরে বর্তমান থাকলেও, তার একজনও শাস্ত্রী নন। আমার পরিচিত যত গুরু পুরোহিত দৈবজ্ঞ কুলজ্ঞ আচার্য অগ্রদানী, এমনকি রাঁধুনে-বামুন পর্যন্ত আমার প্রসাদে সব মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় আমি কি করব না ভেবে পেয়ে, ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে অবস্থিতি করছি, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে সেই স্ত্রীলোকটি উঠে, এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, বা! তুমি এখানে? ভালো আছ তো? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। চলো আমার সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে, তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। প্রথমেই আমার চোখে পড়ল যে, এই রমণীটির শরীরের গড়ন ও চলবার ভঙ্গিতে শিকারী চিতার মত একটা লিকলিকে ভাব আছে। ইতিমধ্যে আড়চোখে একবার দেখে নিলুম যে, গার্গী এবং তাঁর কন্যা হাঁ করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, যেন তাদের মুখের গ্রাস কে কেড়ে নিয়েছে, এবং সে এত ক্ষিপ্রহস্তে যে তাঁরা মুখ বন্ধ করবার অবসর পান নি!

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করবামাত্র, আমার এই বিপদতারিণী আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, ঘণ্টাখানেক ধরে তোমার উপর যে উৎপীড়ন হচ্ছিল আমার আর তা সহ্য হল না, তাই তোমাকে ঐ জর্মন পশুত্বটির হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। তোমার যে কি বিপদ কেটে গেছে তা তুমি জান না। মার দর্শনের পালা শেষ হলেই, মেয়ের কবিত্বের পালা আরম্ভ হত। তুমি ওইসব ন্যাক্ড়ার পুতুলদের চেন না। ওইসব স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন-তেন-প্রকারেণ পুরুষের গললগ্ন হওয়া। পুরুষমানুষ দেখলে ওদের মুখে জল আসে, চোখে তেল আসে; বিশেষত, সে যদি দেখতে সুন্দর হয়।

আমি বললুম, অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি শেষে যে বিপদের কথা বললে, এ ক্ষেত্রে তার কোনো আশঙ্কা ছিল না।

কেন ?

শুধু ও জাতি নয়, আমি সমগ্র স্ত্রীজাতির হাতের বাইরে।

তোমার বয়স কত ?

চব্বিশ।

তুমি বলতে চাও যে, আজ পর্যন্ত কোনো স্ত্রীলোক তোমার চোখে পড়ে নি, তোমার মনে ধরে নি ?

তাই।

মিথ্যে কথা বলাটা যে তুমি একটা আর্ট করে তুলেছ তার প্রমাণ তো এতক্ষণ ধরে পেয়েছি।

সে বিপদে পড়ে।

তবে এ-ই সত্যি যে, একদিনের জন্যেও কেউ তোমার নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারে নি ?

হাঁ, এ-ই সত্যি। কেননা, সে নয়ন, সে মন, একজন চিরদিনের জন্য মুগ্ধ করে রেখেছে।

সুন্দরী ?

জগতে তার আর তুলনা নেই।

তোমার চোখে ?

না, যার চোখ আছে তারই চোখে।

তুমি তাকে ভালোবাস ?

বাসি।

সে তোমাকে ভালোবাসে ?

না।

কি করে জানলে ?

তার ভালোবাসবার ক্ষমতা নেই।

কেন ?

তার হৃদয় নেই।

এ সত্ত্বেও তুমি তাকে ভালোবাস ?

এ সত্ত্বেও নয়, এইজন্যেই আমি তাকে ভালোবাসি। অন্যের ভালোবাসাটা একটা উপদ্রববিশেষ।

তার নাম-ধাম জানতে পারি ?

অবশ্য। তার ধাম প্যারিস, আর নাম ভীনস দ্য মীলো। এই উত্তর শুনে আমার নবসখী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল, তার পরেই হেসে বললে, তোমাকে কথা কইতে কে শিখিয়েছে ?

আমার মন।

এ মন কোথা থেকে পেলে ?

জন্ম থেকে।

এবং তোমার বিশ্বাস, এ মনের আর কোনো বদল হবে না ?

এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার আজ পর্যন্ত তো কোনো কারণ ঘটে নি।

যদি ভীনস দ্য মীলো বেঁচে ওঠে ?

তা হলে আমার মোহ ভেঙে যাবে।

আর আমাদের কারও ভিতরটা যদি পাথর হয়ে যায় ?

এ কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখলুম। আমার স্ট্যাচু-দেখা চোখ তাতে পীড়িত বা ব্যথিত হল না। আমি তার মুখ থেকে আমার চোখ তুলে নিয়ে উত্তর করলুম, তা হলে হয়তো তার পূজা করব।

পূজা নয়, দাসত্ব।

আচ্ছা তাই।

আগে যদি জানতুম যে তুমি এত বাজেও বকতে পার তা হলে আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতুম না। যার জীবনের কোনো জ্ঞান নেই তার দর্শন বকাই উচিত। এখন এসো, মুখ বন্ধ করে আমার সঙ্গে লক্ষ্মীছেলেটির মত বসে দাবা খেলো।

এ প্রস্তাব শুনে আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে সে বললে, আমি যে পথের মধ্যে থেকে তোমাকে লুফে নিয়ে এসেছি সে মোটেই তোমার উপকারের জন্য নয়। ওর ভিতর আমার স্বার্থ আছে। দাবা খেলা হচ্ছে

আমার বাতিক। ও যখন তোমার দেশের খেলা তখন তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলতে জান, এই মনে করে তোমাকে গ্রেপতার করে আনবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

আমি উত্তর করলুম, এর পরেই হয়তো আর-একজন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে, এসো আমাকে ভানুমতীর বাজি দেখাও, তুমি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন অবশ্য জাদু জান।

সে এ কথার উত্তরে একটু হেসে বললে, তুমি এমন-কিছু লোভনীয় বস্তু নও যে, তোমাকে হস্তগত করবার জন্য হোটেল-সুদ্ধ স্ত্রীলোক উতলা হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক, আমার হাত থেকে তোমাকে যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সে ভয় তোমার পাবার দরকার নেই। আর যদি তুমি জাদু জান তা হলে ভয় তো আমাদেরই পাবার কথা।

একবার হিন্দুদর্শন জানি বলে বিষম বিপদে পড়েছিলুম, তাই এবার স্পষ্ট করে বললুম, দাবা খেলতে আমি জানি নে।

শুধু দাবা কেন, দেখছি পৃথিবীর অনেক খেলাই তুমি জান না। আমি যখন তোমাকে হাতে নিয়েছি তখন আমি তোমাকে ওসব শেখাব ও খেলাব।

এর পর আমরা দুজনে দাবা নিয়ে বসে গেলুম। আমার শিক্ষয়িত্রী কোন্ বলের কি নাম, কার কি চাল, এসব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। আমি অবশ্য সে সবই জানতুম, তবু অজ্ঞতার ভান করছিলুম, কেননা তাঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার মন্দ লাগছিল না। আমি ইতিপূর্বে এমন একটি রমণীও দেখি নি যিনি পুরুষ-মানুষের সঙ্গে নিঃসকোচে কথাবার্তা কইতে পারেন; যাঁর সকল কথা, সকল ব্যবহারের ভিতর কতকটা কৃত্রিমতার আবরণ না থাকে। সাধারণত স্ত্রীলোক— সে যে দেশেরই হোক— আমাদের জাতের সুমুখে মন বেআব্রু করতে পারে না। এই আমি প্রথম স্ত্রীলোক দেখলুম, যে পুরুষ-বন্ধুর মত সহজ ও খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে পারে। এর সঙ্গে যে পরদার আড়াল থেকে আলাপ করতে হচ্ছে না এতেই আমি খুশি

হয়েছিলুম। সুতরাং এই শিক্ষা-ব্যাপারটি একটু লম্বা হওয়াতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না।

মাথা নিচু করে অনর্গল বকে গেলেও, আমার সঙ্গিনীটি যে ক্রমান্বয়ে বারান্দার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিল তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। আমি সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে, তার ডিনারের সাথিটি ঘন ঘন পায়চারি করছেন, এবং তাঁর মুখে জ্বলছে চুরট, আর চোখে রাগ। আমার বন্ধুটিও যে তা লক্ষ্য করছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কেননা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, ঐ ভদ্রলোকটি তার মনের উপর একটি চাপের মত বিরাজ করছেন। সকল বলের গতিবিধির পরিচয় দিতে তার বোধ হয় আধ ঘণ্টা লেগেছিল। তার পরে খেলা শুরু হল। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝলুম যে, দাবার বিদ্যে আমাদের দুজনেরই সমান, এক বাজি উঠতে রাত কেটে যাবে। প্রতি চাল দেবার আগে যদি পাঁচ মিনিট করে ভাবতে হয়, তার পর আবার চাল ফিরিয়ে নিতে হয়, তা হলে খেলা যে কতটা এগোয় তা তো বুঝতেই পার। সে যাই হোক, ঘণ্টা-আধেক বাদে সেই জাঁদরেলি-চেহারার সাহেবটি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাদের খেলার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে অতি বিরক্তির স্বরে আমার খেলার সাথিকে সম্বোধন করে বললেন, তা হলে আমি এখন চললুম।

সে কথা শুনে স্ত্রীলোকটি দাবার ছকের দিকে চেয়ে নিতান্ত অন্যমনস্ক-ভাবে উত্তর করলেন, এত শিগগির ?

শিগগির কিরকম ? রাত এগারোটা বেজে গেছে।

তাই নাকি ? তবে যাও, আর দেরি কোরো না। তোমাকে ছ' মাইল ঘোড়ায় যেতে হবে।

কাল আসছ ?

অবশ্য। সে তো কথাই আছে। বেলা দশটার ভিতর গিয়ে পৌঁছব।

কথা ঠিক রাখবে তো ?

আমি বাইবেল হাতে করে তোমার কথার জবাব দিতে পারি-নে।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

পুরুষটি চলে গেলেন, আবার কি মনে করে ফিরে এলেন। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কবে থেকে তুমি দাবা খেলার এত ভক্ত হলে? উত্তর এল, আজ থেকে।

এর পরে সেই সাহেব-পুঙ্গবটি 'হুঁ' এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

আমার সঙ্গিনী অমনি দাবার ঘরটি উলটে ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। মনে হল, পিয়ানোর সব-চাইতে উঁচু সপ্তকের উপর কে যেন অতি হালকাভাবে আঙুল বুলিয়ে গেল। সেইসঙ্গে তার মুখ-চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার ভিতর থেকে যেন একটি প্রাণের ফোয়ারা উছলে পড়ে আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাতির আলো সব হেসে উঠল। ফুলদানের কাটা ফুল সব টাটকা হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে আমার মনের যন্ত্রও এক সুর চড়ে গেল।

তোমার সঙ্গে দাবা খেলবার অর্থ এখন বুঝলে?

না।

ঐ ব্যক্তির হাত এড়াবার জন্য। নইলে আমি দাবা খেলতে বসি? ওর মতো নির্বুদ্ধির খেলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জর্জের মত লোকের সঙ্গে সকাল-সন্ধে একত্র থাকলে শরীর-মন একদম ঝিমিয়ে পড়ে। ওদের কথা শোনা আর আফিং খাওয়া, একই কথা।

কেন?

ওদের সব বিষয়ে মত আছে, অথচ কোনো বিষয়ে মন নেই। ও জাতের লোকের ভিতরে সার আছে কিন্তু রস নেই। ওরা স্ত্রীলোকের স্বামী হবার যেমন উপযুক্ত, সঙ্গী হবার তেমনি অনুপযুক্ত।

কথাটা ঠিক বুঝলুম না। স্বামীই তো স্ত্রীর চিরদিনের সঙ্গী।

চিরদিনের হলেও একদিনেরও নয় এমন হতে পারে, এবং হয়েও থাকে।

তবে কি গুণে তারা স্বামীহিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে ?

ওদের শরীর ও চরিত্র দুয়েরই ভিতর এতটা জোর আছে যে, ওরা জীবনের ভার অবলীলাক্রমে বহন করতে পারে। ওদের প্রকৃতি ঠিক তোমাদের উলটো। ওরা ভাবে না, কাজ করে। এককথায়, ওরা হচ্ছে সমাজের স্তম্ভ ; তোমাদের মত ঘর সাজাবার ছবি কি পুতুল নয়।

হতে পারে, এক দলের লোকের বাইরেটা পাথর আর ভিতরটা সীসে দিয়ে গড়া, আর তারাই হচ্ছে আসল মানুষ ; কিন্তু, তুমি এই দু দণ্ডের পরিচয়ে আমার স্বভাব চিনে নিয়েছ ?

অবশ্য। আমার চোখের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো দেখতে পাবে যে, তার ভিতর এমন-একটি আলো আছে যাতে মানুষের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়।

আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে সে চোখদুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জান ? একরকম রত্ন— ইংরেজিতে যাকে বলে cat's eye ; তার উপর আলোর 'সুত' পড়ে, আর প্রতি মুহূর্তে তার রঙ বদলে যায়।— আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম। ভয় হল, সে-আলো পাছে সত্যি-সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।

এখন বিশ্বাস করছ যে আমার দৃষ্টি মর্মভেদী ?

বিশ্বাস করি আর না করি, স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই।

শুনতে চাও তোমার সঙ্গে জর্জের আসল তফাতটা কোথায় ?

পরের মনের আয়নায় নিজের মনের ছবি কিরকম দেখায় তা বোধ হয় মানুষমাত্রেই জানতে চায়।

একটি উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। জর্জ হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ। ও একরোখে সিধে পথেই চলতে চায়, আর তুমি কোণাকুণি।

এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমাদের হাতে খেলে ভালো ?

আমাদের কাছে ও দুইই সমান। আমরা স্কন্ধে ভর করলে দুয়েরই চাল বদলে যায়। উভয়েই এঁকে-বেঁকে আড়াই-পায়ে চলতে বাধ্য হয়।

পুরুষমানুষকে ওরকম ব্যতিব্যস্ত করে তোমরা কী সুখ পাও ?

এ কথা শুনে সে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি তো আমার ফাদর কন্‌ফেসর নও যে মন খুলে তোমার কাছে আমার সব সুখদুঃখের কথা বলতে হবে। তুমি যদি আমাকে ও ভাবে জেরা করতে শুরু কর তা হলে এখনই আমি উঠে চলে যাব।

এই বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। আমার রূঢ় কথা শোনা অভ্যাস ছিল না, তাই আমি অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করলুম, তুমি যদি চলে যেতে চাও তো আমি তোমাকে থাকতে অনুরোধ করব না। ভুলে যেয়ো না যে, আমি তোমাকে ধরে রাখি নি।

এ কথার পর মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সে অতি বিনীত ও নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমার উপর রাগ করেছ ?

আমি একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করলুম, না। রাগ করবার তো কোনো কারণ নেই।

তবে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ?

এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে গ্যাসের বাতির নীচে বসে বসে আমার মাথা ধরেছে— এই মিথ্যে কথা আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে গেল। এর উত্তরে— দেখি তোমার জ্বর হয়েছে কি না ?— এই কথা বলে সে আমার কপালে হাত দিলে। সে স্পর্শের ভিতর তার আঙুলের ডগার একটু সসংকোচ আদরের ইশারা ছিল। মিনিটখানেক পরে সে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, তোমার মাথা একটু গরম হয়েছে, কিন্তু ও জ্বর নয়। চলো, বাইরে গিয়ে বসবে, তা হলেই ভালো হয়ে যাবে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। তোমরা যদি বল যে সে আমাকে মেস্‌মরাইজ করেছিল তা হলে আমি সে কথার প্রতিবাদ করব না।

বাইরে গিয়ে দেখি সেখানে জনমানব নেই ; যদিও রাত তখন সাড়ে-এগারোটা, তবু সকলে শুতে গিয়েছে। বুঝলুম, ইলফ্রাকোম্ব সত্যি-সত্যিই ঘুমের রাজ্য। আমরা দুজনে দুখানি বেতের চেয়ারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখি, আকাশ আর সমুদ্র দুই এক হয়ে গেছে, দুইই শ্লেটের রঙ। আর আকাশে যেমন তারা জ্বলছে, সমুদ্রের গায়ে তেমনি যেখানে-যেখানে আলো পড়ছে সেখানেই তারা ফুটে উঠছে, এখানে ওখানে সব জলের টুকরো টাকার মত চকচক করছে, পারার মত টলমল করছে। গাছপালার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন স্থানে স্থানে অন্ধকার জমাট হয়ে গিয়েছে। তখন সসাগরা বসুন্ধরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছিল। এই নিস্তব্ধ নিশীথের নিবিড় শান্তি আমার সঙ্গিনীটির হৃদয়-মন স্পর্শ করেছিল ; কেননা, সে কতক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্নভাবে বসে রইল। আমিও চুপ করে রইলুম। তার পর সে চোখ বুজে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার দেশে যোগী বলে একদল লোক আছে, যারা কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে না, আর সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যায় ?

বনে যায়, এ কথা সত্য।

আর সেখানে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অহর্নিশি জপতপ করে ?

এইরকম তো শুনতে পাই।

আর তার ফলে, যত তাদের দেহের ক্ষয় হয় তত তাদের মনের শক্তি বাড়ে, যত তাদের বাইরেটা স্থিরশান্ত হয়ে আসে তত তাদের অন্তরের তেজ ফুটে ওঠে ?

তা হলেও হতে পারে।

হতে পারে বলছ কেন ? শুনেছি, তোমরা বিশ্বাস কর যে, এদের দেহমনে এমন অলৌকিক শক্তি জন্মায় যে, এইসব মুক্ত জীবের স্পর্শে এবং কথায় মানুষের শরীর-মনের সকল অসুখ সেরে যায়।

ওসব মেয়েলি বিশ্বাস।

তোমার নয় কেন ?

আমি যা জানি নে তা বিশ্বাস করি নে। আমি এর সত্যি-মিথ্যে কি করে জানব? আমি তো আর যোগ অভ্যাস করি নি।

আমি ভেবেছিলুম তুমি করেছ।

এ অদ্ভুত ধারণা তোমার কিসের থেকে হল?

ঐ জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের মত তোমার মুখে একটা শীর্ণ ও চোখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব আছে।

তার কারণ অনিদ্রা।

আর অনাহার। তোমার চোখে মনের অনিদ্রা ও হৃদয়ের উপবাস, এ দুয়েরই লক্ষণ আছে। তোমার মুখের ঐ ছাই-চাপা আগুনের চেহারা প্রথমেই আমার চোখে পড়ে। একটা অদ্ভুত কিছু দেখলে মানুষের চোখ সহজেই তার দিকে যায়, তার বিষয় সবিশেষ জানবার জন্য মন লালায়িত হয়ে ওঠে। জর্জের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য যে তোমার আশ্রয় নিই, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখবার জন্যই আমি তোমার কাছে আসি।

আমার তপোভঙ্গ করবার জন্য?

তুমি যেদিন সেন্ট অ্যান্টনি হয়ে উঠবে, আমিও সেদিন স্বর্গের অপ্সরা হয়ে দাঁড়াব। ইতিমধ্যে তোমার ঐ গেরুয়া রঙের মিনে-করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে তাই জানবার জন্য আমার কৌতূহল হয়েছিল।

কি ধাতু আবিষ্কার করলে শুনতে পারি?

আমি জানি তুমি কি শুনতে চাও।

তা হলে তুমি আমার মনের সেই কথা জান যা আমি জানি নে।

অবশ্য। তুমি চাও, আমি বলি— চুম্বক।

কথাটি শোনবামাত্র আমার জ্ঞান হল যে, এ উত্তর শুনলে আমি খুশি হতুম, যদি তা বিশ্বাস করতুম। এই নব আকাঙ্ক্ষা সে আমার মনের ভিতর আবিষ্কার করলে কি নির্মাণ করলে, তা আমি আজও জানি নে। আমি মনে-মনে উত্তর খুঁজছি, এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, ক'টা বেজেছে?

আমি ঘড়ি দেখে বললুম, বারোটা।

বারোটা শুনে সে লাফিয়ে উঠে বললে, উঃ! এত রাত হয়ে গেছে? তুমি মানুষকে এত বকাতেও পার। যাই, শুতে যাই। কাল সকাল-সকাল উঠতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, তাও আবার দশটার ভিতর পৌঁছতে হবে।

কোথায় যেতে হবে?

একটা শিকারে। কেন, তুমি কি জান না। তোমার সুমুখেই তো জর্জের সঙ্গে কথা হল।

তা হলে সে কথা তুমি রাখবে?

তোমার কিসে মনে হল যে রাখব না?

তুমি যে ভাবে তার উত্তর দিলে।

সে শুধু জর্জকে একটু নিগ্রহ করবার জন্য। আজ রাত্তিরে ওর ঘুম হবে না। আর জানই তো, ওদের পক্ষে জেগে থাকা কত কষ্ট।

তোমার দেখছি বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনুগ্রহ অতি বেশি।

অবশ্য। জর্জের মত পুরুষমানুষের মনকে মাঝে-মাঝে একটু উস্‌কে না দিলে তা সহজেই নিবে যায়। আর তা ছাড়া, ওদের মনে খোঁচা মারার ভিতর বেশি কিছু নিষ্ঠুরতাও নেই। ওদের মনে কেউ বেশি কষ্ট দিতে পারে না, ওরাও এক প্রহার দেওয়া ছাড়া স্ত্রীলোককে অন্য কোনো কষ্ট দিতে পারে না। সেইজন্যই তো ওরা আদর্শ স্বামী হয়। মন নিয়ে কাড়াকড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি, সে তোমার মত লোকেই করে।

তোমার কথা আমার হেঁয়ালির মত লাগছে।

যদি হেঁয়ালি হয় তো তাই হোক। তোমার জন্যে আমি আর তার ব্যাখ্যা করতে পারি নে। আমার যেমন শ্রান্ত মনে হচ্ছে তেমনি ঘুম পাচ্ছে। তোমার ঘর উপরে?

হাঁ।

তবে এখন ওঠো, উপরে যাওয়া যাক।

আমরা দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলুম।

করিডরে পৌঁছবামাত্র সে বললে, ভালো কথা, তোমার একখানা কার্ড আমাকে দাও।

আমি কার্ডখানি দিলুম। সে আমার নাম পড়ে বললে, তোমাকে আমি সু বলে ডাকব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব?

উত্তর— যা-খুশি একটা কিছু বানিয়ে নাও না। ভালো কথা, আজ তোমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি তাতে তোমার আমাকে সেইভিয়র বলে ডাকা উচিত।

তথাস্তু।

তোমার ভাষায় ওর নাম কি?

আমার দেশে বিপন্নকে যিনি উদ্ধার করেন তিনি দেব নন, দেবী; তাঁর নাম তারিণী।

বাঃ, দিব্যি নাম তো! ওর তা-টি বাদ দিয়ে আমাকে রিণী বলে ডেকো।

এই কথাবার্তা কইতে কইতে আমরা সিঁড়িতে উঠছিলুম। একটা গ্যাসের বাতির কাছে আসবামাত্র সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, আমার হাতের দিকে চেয়ে বললে, দেখি দেখি, তোমার হাতে কি হয়েছে?

অমনি নিজের হাতের দিকে আমার চোখ পড়ল, দেখি হাতটি লাল টকটক করছে, যেন কে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। সে আমার ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, কার বুকের রক্তে হাত ছুপিয়েছ—অবশ্য ভীনস দ্য মীলোর নয়?

না, নিজের।

এতক্ষণ পরে একটি সত্য কথা বলেছ। আশা করি এ রঙ পাকা। কেননা, যে দিন রঙ ছুটে যাবে সেদিন, জেনো, তোমার সঙ্গে আমার ভাবও চটে যাবে। যাও, এখন শোও গে। ভালো করে ঘুমিয়ো, আর আমার বিষয় স্বপ্ন দেখো।

এই কথা বলে সে দু লাফে অন্তর্ধান হল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে আরশিতে নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলুম। এক বোতল শ্যাম্পেন খেলে মানুষের যেরকম চেহারা হয় আমার ঠিক সেইরকম হয়েছিল। দেখি দুই গালে রক্ত দেখা দিয়েছে, আর চোখের তারা দুটি শুধু জ্বলজ্বল করছে— বাকি অংশ ছলছল করছে। সে সময় আমার নিজের চেহারা আমার চোখে বড় সুন্দর লেগেছিল। আমি অবশ্য তাকে স্বপ্নে দেখি নি, কেননা সে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় নি।

২

সে রাত্তিরে আমরা দুজনে যে জীবন-নাটকের অভিনয় শুরু করি, বছরখানেক পরে আর-এক রাত্তিরে তার শেষ হয়। আমি প্রথম দিনের সব ঘটনা তোমাদের বলেছি, আর শেষ দিনের বলব— কেননা এ দু দিনের সকল কথা আমার মনে আজও গাঁথা রয়েছে। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে যা ঘটেছিল সেসব আমার মনের ভিতর, বাইরে নয়। যে ব্যাপারে বাহ্য ঘটনার বৈচিত্র্য নেই তার কাহিনী বলা যায় না। আমার মনের সে বৎসরের ডাক্তারি-ডায়রি যখন আমি নিজেই পড়তে ভয় পাই তখন তোমাদের তা পড়ে শোনাবার আমার তিলমাত্রও অভিপ্রায় নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার মনের অদৃশ্য তারগুলি রিণী তার দশ আঙুলে এমনি করে ধরে সে মনকে পুতুল-নাচিয়েছিল। আমার অন্তরে সে যে প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল তাকে ভালোবাসা বলে কি না জানি নে; এইমাত্র জানি যে, সে মনোভাবের ভিতর অহংকার ছিল, অভিমান ছিল, রাগ ছিল, জেদ ছিল, আর সেইসঙ্গে ছিল করুণ মধুর দাস্য ও সখ্য এই চারটি হৃদয়রস। এর মধ্যে যা লেশমাত্রও ছিল না সে হচ্ছে দেহের নাম কি গন্ধ। আমার মনের এই কড়িকোমল পরদাগুলির উপর সে তার আঙুল চালিয়ে যখন যেমন-ইচ্ছে তখনি তেমনি সুর বার করতে পারত। তার আঙুলের টিপে সে সুর কখনো-বা অতি-কোমল, কখনো-বা অতি-তীব্র হত।

একটি ফরাসি কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া।

তাকে ধরতে যাও, সে পালিয়ে যাবে ; আর তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু-পিছু ছুটে আসবে। আমি বারো মাস ধরে এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশি লুকোচুরি খেলেছিলুম। এ খেলার ভিতর কোনো সুখ ছিল না। অথচ এ খেলা সাঙ্গ করবার শক্তিও আমার ছিল না। অনিদ্রাগ্রস্ত লোক যেমন যত বেশি ঘুমতে চেষ্টা করে তত বেশি জেগে ওঠে, আমিও তেমনি যত বেশি এই খেলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতুম, তত বেশি জড়িয়ে পড়তুম। সত্য কথা বলতে গেলে এ খেলা বন্ধ করবার জন্য আমার আগ্রহও ছিল না, কেননা, আমার মনের এই নব অশান্তির মধ্যে নবজীবনের তীব্র স্বাদ ছিল।

আমি যে শত চেষ্টাতেও রিণীর মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারি নি তার জন্য আমি লজ্জিত নই ; কেননা, আকাশ-বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতরে চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে-দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি, আর-একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া, সে ছিল একাধারে শিশু বালিকা যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোটছেলের মত ব্যবহার করত ; আমার নাক ধরে টানত, চুল ধরে টানত, মুখ ভ্যাংচাত, জিভ বার করে দেখাত। আবার কখনো-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, যেন আপন মনে, নিজের ছেলেবেলাকার গল্প করে যেত। তাকে কে কবে বকেছে, কে কবে আদর করেছে, সে কবে কি পড়েছে, কবে কি প্রাইজ পেয়েছে, কবে বনভোজন করেছে, কবে ঘোড়া থেকে পড়েছে— যখন সে এইসকলের খুঁটিয়ে বর্ণনা করত তখন একটি বালিকা-মনের স্পষ্ট ছবি দেখতে পেতুম। সে ছবির রেখাগুলি যেমন সরল, তার বর্ণও তেমনি উজ্জ্বল। তার পর সে ছিল গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিক। একটি আব্‌লুশ-কাঠের ক্রুশে-আঁটা রুপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুলত, এক মুহূর্তের জন্যও সে তা স্থানান্তরিত করে নি।

সে যখন তার ধর্মের বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করত তখন মনে হত, তার বয়েস আশি বৎসর। সে সময়ে তার সরল বিশ্বাসের সুমুখে আমার দার্শনিক বুদ্ধি মাথা হেঁট করে থাকত। কিন্তু আসলে সে ছিল পূর্ণযুবতী— যদি যৌবনের অর্থ হয় প্রাণের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। তার সকল মনোভাব, সকল ব্যবহার, সকল কথার ভিতর এমন-একটি প্রাণের জোয়ার বইত যার তোড়ে আমার অন্তরাত্মা অবিশ্রান্ত তোলপাড় করত। আমরা মাসে দশ বার করে ঝগড়া করতুম, আর ঈশ্বরসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করতুম যে, জীবনে আর কখনো পরস্পরের মুখ দেখব না। কিন্তু দু দিন না যেতেই, হয় আমি তার কাছে ছুটে যেতুম, নয় সে আমার কাছে ছুটে আসত। তখন আমরা আগের কথা সব ভুলে যেতুম, সেই পুনর্মিলন আবার আমাদের প্রথমমিলন হয়ে উঠত। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছিল। আমাদের শেষ ঝগড়াটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম যে, সে আমার মনের সর্বপ্রধান দুর্বলতাটি আবিষ্কার করেছিল— তার নাম জেলসি। যে মনের আগুনে মানুষ জ্বলেপুড়ে মরে, রিণী সে আগুন জ্বালাবার মন্ত্র জানত। আমি পৃথিবীতে বহু লোককে অবজ্ঞা করে এসেছি, কিন্তু ইতিপূর্বে কাউকে কখনো হিংসা করি নি। বিশেষত জর্জের মত লোককে হিংসা করার চাইতে আমার মত লোকের পক্ষে বেশি কি হীনতা হতে পারে? কারণ, আমার যা ছিল ও হচ্ছে টাকার জোর আর গায়ের জোর। কিন্তু রিণী আমাকে এ হীনতাও স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। তার শেষ বারের ব্যবহার আমার কাছে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অপমানজনক মনে হয়েছিল। নিজের মনের দুর্বলতার স্পষ্ট পরিচয় পাবার মত কষ্টকর জিনিস মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। ভয় যেমন মানুষকে দুঃসাহসিক করে তোলে, আমার ঐ দুর্বলতাই তেমনি আমার মনকে এত শক্ত করে তুলেছিল যে, আমি আর কখনো তার মুখদর্শন করতুম না যদি-না সে আমাকে চিঠি লিখত। সে চিঠির প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে; সে চিঠি এই।—

তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয় তখন দেখেছিলুম যে, তোমার শরীর ভেঙে পড়ছে। আমার মনে হয়, তোমার পক্ষে একটা চেঞ্জ নিতান্ত আবশ্যক। আমি যেখানে আছি সেখানকার হাওয়া মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে। এ জায়গাটা একটি অতি ছোট পল্লীগ্রাম। এখানে তোমার থাকবার মত কোনো স্থান নেই। কিন্তু এর ঠিক পরের স্টেশনটিতে অনেক ভালো ভালো হোটেল আছে। আমার ইচ্ছে, তুমি কালই লণ্ডন ছেড়ে সেখানে যাও। এখন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ; আর দেরি করলে এমন চমৎকার সময় আর পাবে না। যদি হাতে টাকা না থাকে আমাকে টেলিগ্রাম কোরো, আমি পাঠিয়ে দেব। পরে সুদসুদ্ধ তা শুধে দিয়ো।

আমি চিঠির কোনো উত্তর দিলুম না, কিন্তু পরদিন সকালের ট্রেনেই লণ্ডন ছাড়লুম। আমি কোনো কারণে তোমাদের কাছে সে জায়গার নাম করব না। এই পর্যন্ত বলে রাখি, রিণী যেখানে ছিল তার নামের প্রথম অক্ষর B, এবং তার পরের স্টেশনের নামের প্রথম অক্ষর W। ট্রেন যখন B স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দুটো। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, রিণী প্ল্যাটফরমে নেই। তার পর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, প্ল্যাটফরমের রেলিঙের উপরে রাস্তার ধারে একটি গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে যে কেন আমি তাকে দেখতে পাই নি ঐই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলুম, কেননা সে যে-রঙের কাপড় পরেছিল তা আধ ক্রোশ দূর থেকে মানুষের চোখে পড়ে— একটি মিশমিশে কালো গাউনের উপর একটি ডগ্‌ডগে হল্‌দে জ্যাকেট। সেদিনকে রিণী এক অপ্রত্যাশিত নতুন মূর্তিতে, আমাদের দেশের নববধূর মূর্তিতে, দেখা দিয়েছিল। এই বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে গড়া রমণীর মুখে আমি পূর্বে কখনো লজ্জার চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই নি। কিন্তু সেদিন তার মুখে যে হাসি ঈষৎ ফুটে উঠেছিল সে লজ্জার রক্তিম হাসি। সে চোখ তুলে আমার দিকে ভালো করে চাইতে পারছিল না। তার মুখখানি এত মিষ্টি দেখাচ্ছিল যে, আমি চোখ ভরে প্রাণ ভরে

তাই দেখতে লাগলুম। আমি যদি কখনো তাকে ভালোবেসে থাকি তো সেই দিন সেই মুহূর্তে। মানুষের সমস্ত মনটা যে এক মুহূর্তে এমন রঙ ধরে উঠতে পারে, এ সত্যের পরিচয় আমি সেই দিন প্রথম পাই।

ট্রেন B স্টেশনে বোধ হয় মিনিট-খানেকের বেশি থামে নি, কিন্তু সেই এক মিনিট আমার কাছে অনন্তকাল হয়েছিল। তার মিনিট-পাঁচেক পরে ট্রেন W স্টেশনে পৌঁছল। আমি সমুদ্রের ধারে একটি বড় হোটেলে গিয়ে উঠলুম। কেন জানি নে, হোটেলে পৌঁছেই আমার অগাধ শ্রান্তি বোধ হতে লাগল। আমি কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। এই একটিমাত্র দিন, যখন আমি বিলেতে দিবানিদ্রা দিয়েছি, আর এমন ঘুম আমি জীবনে কখনো ঘুমই নি। জেগে উঠে দেখি, পাঁচটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নীচে এসে চা খেয়ে পদব্রজে Bর অভিমুখে যাত্রা করলুম। যখন সে গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলুম তখন প্রায় সাতটা বাজে; তখনো আকাশে যথেষ্ট আলো ছিল। বিলেতে, জানই তো, গ্রীষ্মকালের রাত্তির দিনের জের টেনে নিয়ে আসে; সূর্য অস্ত গেলেও তার পশ্চিম-আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত্তিরের গায়ে জড়িয়ে থাকে। রিণী কোন্ পাড়ায় কোন্ বাড়িতে থাকে তা আমি জানতুম না; কিন্তু আমি এটা জানতুম যে, W থেকে B যাবার রাস্তায় কোথায়ও-না-কোথায়ও তার দেখা পাব।

Bর সীমাতে পা দেবামাত্রই দেখি, একটি স্ত্রীলোক একটু উতলাভাবে রাস্তায় পায়চারি করছে। দূর থেকে তাকে চিনতে পারি নি, কেননা ইতিমধ্যে রিণী তার পোশাক বদলে ফেলেছিল। সে কাপড়ের রঙের নাম জানি নে, এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, সেই সন্ধের আলোর সঙ্গে সে এক হয়ে গিয়েছিল— সে রঙ যেন গোধূলিতে ছোপানো।

আমাকে দেখবামাত্র রিণী আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে সেই দিকে এগোতে লাগলুম। আমি জানতুম যে, সে এই গাছপালার ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে, সহজে ধরা দেবে না, একটু খুঁজেপেতে তাকে বার করতে

হবে। আমি অবশ্য তার এ ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে যাই নি, কেননা এতদিনে আমার শিক্ষা হয়েছিল যে, রিণী যে কখন কি ব্যবহার করবে তা অপরের জানা দূরে থাক্, সে নিজেই জানত না। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ডান দিকে বনের ভিতর একটি গলি-রাস্তার ধারে একটি ওক-গাছের আড়ালে রিণী দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে যাতে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরা আলো তার মুখের উপর এসে পড়ে। আমি অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে লাগলুম, সে চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়িয়েই রইল। তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীমূর্তির মত দেখাচ্ছিল— সে মূর্তি যেমন সুন্দর তেমনি কঠিন। আমি কাছে যাবামাত্র, সে দুহাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলে। আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। দুজনের কারও মুখে কথা নেই। কতক্ষণ এ ভাবে গেল জানি নে। তার পর প্রথমে কথা অবশ্য রিণীই কইলে, কেননা সে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারত না, বিশেষত আমার কাছে। তার কথার স্বরে ঝগড়ার পূর্বাভাস ছিল। প্রথম সম্ভাষণ হল এই— তুমি এখান থেকে চলে যাও! আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই নে, তোমার মুখ দেখতে চাই নে।

আমার অপরাধ?

তুমি এখানে কেন এলে?

তুমি আসতে লিখেছ বলে।

সেদিন আমার বড় মন-খারাপ ছিল। বড় একা-একা মনে হচ্ছিল বলে ঐ চিঠি লিখি। কিন্তু কখনো মনে করি নি, তুমি চিঠি পাবামাত্র ছুটে এখানে চলে আসবে। তুমি জান যে, মা যদি টের পান যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই তা হলে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে?

ইয়ারকি শব্দটি আমার কানে খট্ করে লাগল, আমি ঈষৎ বিরক্তভাবে বললুম, তোমার মুখেই তা শুনেছি। তার সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও তুমি ভাব নি যে আমি আসব?

স্বপ্নেও না।

তা হলে ট্রেন আসবার সময় কার খোঁজে স্টেশনে গিয়েছিলে?

কারও খোঁজে নয়। চিঠি ডাকে দিতে।

তা হলে ওরকম কাপড় পরেছিলে কেন, যা আধ ক্রোশ দূর থেকে কানা লোকেরও চোখে পড়ে?

তোমার সুনজরে পড়বার জন্য।

সু হোক, কু হোক, আমার নজরেই পড়বার জন্য।

তোমার বিশ্বাস তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি নি?

তা কি করে বলব! এই তো এতক্ষণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছ।

সে চোখে আলো সইছে না বলে। আমার চোখে অসুখ করেছে।

দেখি কি হয়েছে।—এই বলে আমি আমার হাত দিয়ে তার মুখ থেকে তার হাত দুখানি তুলে নেবার চেষ্টা করলুম।

রিণী বললে, তুমি হাত সরিয়ে নাও, নইলে আমি চোখ খুলব না। আর তুমি জান যে, জোরে তুমি আমার সঙ্গে পারবে না।

আমি জানি যে আমি জর্জ নই। গায়ের জোরে আমি কারো চোখ খোলাতে পারব না।

এ কথা শুনে রিণী মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে, মহা উত্তেজিতভাবে বললে, আমার চোখ খোলাবার জন্য কারো ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি তো আর তোমার মত অন্ধ নই! তোমার যদি কারো ভিতরটা দেখবার শক্তি থাকত তা হলে তুমি আমাকে যখন-তখন এত অস্থির করে তুলতে না। জান, আমি কেন রাগ করেছিলুম? তোমার ঐ কাপড় দেখে। তোমাকে ও কাপড়ে আজ দেখব না বলে আমি চোখ বন্ধ করেছিলুম।

কেন, এ কাপড়ের কি দোষ হয়েছে? এটি তো আমার সব-চাইতে সুন্দর পোশাক।

দোষ এই যে, এ সে কাপড় নয় যে কাপড়ে আমি তোমাকে প্রথম দেখি।

এ কথা শোনবামাত্র আমার মনে পড়ে গেল যে, রিণী সেই কাপড় পরে আছে যে কাপড়ে আমি প্রথম তাকে ইল্‌ফ্রাকোম্বে দেখি। আমি ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বললুম, এ কথা আমার মনে হয় নি যে আমরা পুরুষমানুষ, কি পরি-না-পরি তাতে তোমাদের কিছু যায়-আসে।

না, আমরা তো আর মানুষ নই, আমাদের তো আর চোখ নেই! তোমার হয়তো বিশ্বাস যে, তোমরা সুন্দর হও, কুৎসিত হও, তাতেও আমাদের কিছু যায়-আসে না।

আমার তো তাই বিশ্বাস।

তবে কিসের টানে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াও?

রূপের?

অবশ্য! তুমি হয়তো ভাব, তোমার কথা শুনে আমি মোহিত হয়েছি। স্বীকার করি তোমার কথা শুনতে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে— শুধু তা নয়, নেশাও ধরে। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শোনবার আগে যে কুক্ষণে আমি তোমাকে দেখি, সেই ক্ষণে আমি বুঝেছিলুম যে, আমার জীবনে একটি নূতন জ্বালার সৃষ্টি হল। আমি চাই আর না চাই, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের চিরসংঘর্ষ থেকেই যাবে।

এসব কথা তো এর আগে তুমি কখনো বল নি।

ও কানে শোনবার কথা নয়, চোখে দেখবার জিনিস। সাধে কি তোমাকে আমি অন্ধ বলি? এখন শুনলে তো, এসো সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। আজকে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

যে পথ ধরে চললুম সে পথটি যেমন সরু, দুপাশের বড় বড় গাছের ছায়ায় তেমনি অন্ধকার। আমি পদে পদে হোঁচট খেতে লাগলুম। রিণী বললে, আমি পথ চিনি, তুমি আমার হাত ধর, আমি তোমাকে নিরাপদে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে দেব। আমি তার হাত ধরে নীরবে

সেই অন্ধকার পথে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমি অনুমানে বুঝলুম যে, এই নির্জন অন্ধকারের প্রভাব তার মনকে শান্ত বশীভূত করে আনছে। কিছুক্ষণ পর প্রমাণ পেলুম যে আমার অনুমান ঠিক।

মিনিট-দশেক পরে রিণী বললে, সু, তুমি জান যে তোমার হাত তোমার মুখের চাইতে ঢের সত্যবাদী ?

তার অর্থ ?

তার অর্থ, তুমি মুখে যা চেপে রাখ, তোমার হাতে তা ধরা পড়ে।

সে বস্তু কি ?

তোমার হৃদয়।

তার পর ?

তার পর, তোমার রক্তের ভিতর যে বিদ্যুৎ আছে, তোমার আঙুলের মুখ দিয়ে তা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। তার স্পর্শে সে বিদ্যুৎ সমস্ত শরীরে চারিয়ে যায়, শিরের ভিতর গিয়ে রিরি করে।

রিণী, তুমি আমাকে আজ এসব কথা এত করে বলছ কেন। এতে আমার মন ভুলবে না, শুধু অহংকার বাড়বে।— আমার অহংকারের নেশা এমনি যথেষ্ট আছে, তার আর মাত্রা চড়িয়ে তোমার কি লাভ ?

সু, যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে তা তোমার দেহের কি মনের, আমি জানি নে। তোমার মন ও চরিত্রের কতক অংশ অতি স্পষ্ট, আর কতক অংশ অতি অস্পষ্ট। তোমার মুখের উপর তোমার ঐ মনের ছাপ আছে। এই আলোছায়ায়-আঁকা ছবিই আমার চোখে এত সুন্দর লাগে, আমার মনকে এত টানে। সে যাই হোক, আজ আমি তোমাকে শুধু সত্যকথা বলছি ও বলব, যদিও তোমার অহংকারের মাত্রা বাড়ানোতে আমার ক্ষতি বই লাভ নেই।

কি ক্ষতি ?

তুমি জান আর না জান, আমি জানি যে, তুমি আমার উপর যত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ তার মূলে তোমার অহং ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করেছি ?

হাঁ তুমি।— আগের কথা ছেড়ে দাও, এই এক মাস তুমি জান যে আমার কি কষ্টে কেটেছে। প্রতিদিন যখন ডাকপিয়ন এসে দুয়োরে নক্ করেছে আমি অমনি ছুটে গিয়েছি— দেখতে, তোমার চিঠি এল কি না। দিনের ভিতর দশ বার করে তুমি আমার আশা ভঙ্গ করেছ। শেষটা এই অপমান আর সহ্য করতে না পেরে আমি লণ্ডন থেকে এখানে পালিয়ে আসি।

যদি সত্যই এত কষ্ট পেয়ে থাক তবে সে কষ্ট তুমি ইচ্ছে করে ভোগ করেছ।

কেন ?

আমাকে লিখলেই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

ঐ কথাতেই তো নিজেকে ধরা দিলে। তুমি তোমার অহংকার ছাড়তে পার না, কিন্তু আমাকে তোমার জন্য তা ছাড়তে হবে। শেষে হলও তাই। আমার অহংকার চূর্ণ করে তোমার পায়ে ধরে দিয়েছি, তাই আজ তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে দেখা দিতে এসেছ।

এ কথার উত্তরে আমি বললুম, কষ্ট তুমি পেয়েছ ? তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে অবধি আমার দিন যে কি আরামে কেটেছে তা ভগবানই জানেন।

এ পৃথিবীতে এক জড়পদার্থ ছাড়া আর কারো আরামে থাকবার অধিকার নেই। আমি তোমার জড়হৃদয়কে জীবন্ত করে তুলেছি, এই তো আমার অপরাধ? তোমার বুকের তারে মীড় টেনে কোমল সুর বার করতে হয়। একে যদি তুমি পীড়ন করা বল তা হলে আমার কিছু বলবার নেই।

এই সময় আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমুখে দিগন্তবিস্তৃত গোধূলি-ধূসর জলের মরুভূমি ধুধু করছে। তখনো আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখলুম রিণীর মুখ গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু সে দৃষ্টির কোনো লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল তা ঐ সমুদ্রের মতই একটা অসীম উদাস ভাব।

রিণী আমার হাত ছেড়ে দিলে, আমরা দুজনে বালির উপরে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললুম, রিণী, তুমি কি আমাকে সত্যই ভালোবাসো ?

বাসি।

কবে থেকে ?

যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় সেই দিন থেকে। আমার মনের এ প্রকৃতি নয় যে তা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠবে। এ মন এক মুহূর্তে দপ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু এ জীবনে সে আগুন আর নেভে না। আর তুমি ?

তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বহুরূপী যে, তার কোনো একটি নাম দেওয়া যায় না। যার পরিচয় আমি নিজেই ভালো করে জানি নে, তোমাকে তা কি বলে জানাব ?

তোমার মনের কথা তুমি জান আর না জান, আমি জানতুম।

আমি যে জানতুম না সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি জানতে কি না বলতে পারি নে।

আমি যে জানতুম তা প্রমাণ করে দিচ্ছি। তুমি ভাবতে যে, আমার সঙ্গে তুমি শুধু মন নিয়ে খেলা করছ।

তা ঠিক।

আর এ খেলায় তোমার জেতবার এতটা জেদ ছিল যে, তার জন্য তুমি প্রাণপণ করেছিলে।

এ কথাও ঠিক।

কবে বুঝলে যে এ শুধু খেলা নয় ?

আজ।

কি করে ?

যখন তোমাকে স্টেশনে দেখলুম তখন তোমার মুখে আমি নিজের মনের চেহারা দেখতে পেলুম।

এতদিন তা দেখতে পাও নি কেন।

তোমার মন আর আমার মনের ভিতর তোমার অহংকার আর আমার অহংকারের জোড়া পর্দা ছিল। তোমার মনের পর্দার সঙ্গেসঙ্গে আমার মনের পর্দাও উঠে গেছে।

তুমি যে আমাকে কত ভালোবাস সে কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না।

কেন ?

তাও আমি জানি।

কতটা ?

জীবনের চাইতে বেশি। যখন তোমার মনে হয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি নে তখন তোমার কাছে বিশ্ব খালি হয়ে যায়, জীবনের কোনো অর্থ থাকে না।

এ সত্য কি করে জানলে ?

নিজের মন থেকে।

এই কথার পর রিণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, রাত হয়ে গেছে, আমার বাড়ি যেতে হবে ; চলো, তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। — রিণী পথ দেখাবার জন্য আগে আগে চলতে লাগল, আমি নীরবে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করলুম।

মিনিট-দশেক পরে রিণী বললে, আমরা এতদিন ধরে যে নাটকের অভিনয় করছি, আজ তার শেষ হওয়া উচিত।

মিলনান্ত না বিয়োগান্ত ?

সে তোমার হাতে।

আমি বললুম, যারা এক মাস পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না তাদের পক্ষে সমস্ত জীবন পরস্পরকে ছেড়ে থাকা কি সম্ভব ?

তা হলে একত্র থাকবার জন্য তাদের কি করতে হবে ?

বিবাহ।

তুমি কি সকল দিক ভেবে চিন্তে এ প্রস্তাব করছ ?

আমার আর কোনো দিক ভাববার চিন্তবার ক্ষমতা নেই। এইমাত্র

আমি জানি যে, তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদিনও থাকতে পারব না।

তুমি রোমান ক্যাথলিক হতে রাজি আছ?

এ কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি নিরুত্তর রইলুম।

এর উত্তর ভেবে তুমি কাল দিয়ো। এখন আর সময় নেই, ওই দেখো তোমার ট্রেন আসছে— শিগগির টিকেট কিনে নিয়ে এসো, আমি তোমার জন্য প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করব।

আমি তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে নিয়ে এসে দেখি রিণী অদৃশ্য হয়েছে। আমি একটি ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সেখান থেকে জর্জ নামলেন। আমি ট্রেনে চড়তে-না-চড়তে গাড়ি ছেড়ে দিলে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি রিণী আর জর্জ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

সে রাত্তিরে বিকারের রোগীর মাথার যে অবস্থা হয় আমার তাই হয়েছিল— অর্থাৎ, আমি ঘুমোইও নি, জেগেও ছিলুম না।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র চাকরে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। শিরোনামায় দেখি, রিণীর হস্তাক্ষর।

খুলে যা পড়লুম তা এই—

এখন রাত বারোটা। কিন্তু এমন-একটা সুখবর আছে যা তোমাকে এখনই না দিয়ে থাকতে পারছি নে। আমি এক বৎসর ধরে যা চেয়েছিলুম আজ তা হয়েছে। জর্জ আজ আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছে, আমি অবশ্য তাতে রাজি হয়েছি। এর জন্য ধন্যবাদটা বিশেষ করে তোমারই প্রাপ্য। কারণ জর্জের মত পুরুষমানুষের মনে আমার মত রমণীকে পেতেও যেমন লোভ হয়, নিতেও তেমনি ভয় হয়। তাতেই ওদের মন স্থির করতে এত দেরি লাগে যে আমরা একটু সাহায্য না করলে সে মন আর কখনোই স্থির হয় না। ওদের কাছে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে জেলসি; ওদের মনে যত জেলসি বাড়ে, ওরা

ভাবে, ওরা তত বেশি ভালোবাসে। স্টেশনে তোমাকে দেখেই জর্জ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ; তার পর যখন শুনল যে, তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে তখন সে আর কালবিলম্ব না করে আমাদের বিয়ে ঠিক করে ফেললে। এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইব, এবং তুমিও আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থেকো। কেননা, তুমি যে কি পাগলামি করতে বসেছিলে তা পরে বুঝবে। আমি বাস্তবিকই আজ তোমার সেইভিয়র হয়েছি। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ এই যে, তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি যে, আমি আমার নতুন জীবন আরম্ভ করলে দু দিনেই তোমাকে ভুলে যাব, আর তুমি যদি আমাকে শিগগির ভুলতে চাও তা হলে মিস হিল্‌ডেস্‌হাইমরকে খুঁজে বার করে তাকে বিবাহ করো। সে যে আদর্শ স্ত্রী হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, আমি যদি জর্জকে বিয়ে করে সুখে থাকতে পারি, তা হলে তুমি যে মিস হিল্‌ডেস্‌হাইমরকে নিয়ে কেন সুখে থাকতে পারবে না তা বুঝতে পারি নে। ভয়ানক মাথা ধরেছে, আর লিখতে পারি নে। আদিয়।

এ ব্যাপারে আমি কি জর্জ, কে বেশি কৃপার পাত্র, তা আমি আজও বুঝতে পারি নি।

এ কথা শুনে সেন হেসে বললেন, দেখো সোমনাথ, তোমার অহংকারই এ বিষয়ে তোমাকে নির্বোধ করে রেখেছে। এর ভিতর আর বোঝবার কি আছে ? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তোমার রিণী তোমাকে বাঁদর নাচিয়েছে এবং ঠকিয়েছে— সীতেশের তিনি যেমন তাকে করেছিলেন। সীতেশের মোহ ছিল শুধু এক ঘণ্টা, তোমার তা আজও কাটে নি। যে কথা স্বীকার করবার সাহস সীতেশের আছে ; তোমার তা নেই। ও তোমার অহংকারে বাধে।

সোমনাথ উত্তর করলেন, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ, তত নয়।

তা হলে আর-একটু বলি। আমি রিণীর পত্রপাঠে প্যারিসে যাই। মনস্থির করেছিলুম যে, যতদিন-না আমার প্রবাসের মেয়াদ ফুরোয় ততদিন সেখানেই থাকব, এবং লণ্ডনে শুধু ইন্এর টার্ম রাখতে বছরে চারবার করে যাব, এবং প্রতি ক্ষেপে ছ দিন করে থাকব। মাসখানেক পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলে বসে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি রিণী এসে উপস্থিত। আমি তাকে দেখে চমকে উঠে বললুম যে, তবে তুমি জর্জকে বিয়ে কর নি, আমাকে শুধু ভোগা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলে?

সে হেসে উত্তর করলে, বিয়ে না করলে প্যারিসে হনিমূন করতে এলুম কি করে? তোমার খোঁজ নিয়ে, তুমি এখানে আছ জেনে, আমি জর্জকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে এখানে এনেছি। আজ তিনি তাঁর একটি বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছেন, আর আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সে সন্ধেটা রিণী আমার সঙ্গে গল্প করে কাটালে। সে গল্প হচ্ছে তার বিয়ের রিপোর্ট। আমাকে বসে বসে ও ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা শুনতে হল। চলে যাবার সময় সে বললে, সেদিন তোমার কাছে ভালো করে বিদায় নেওয়া হয় নি। পাছে তুমি আমার উপর রাগ করে থাক এই মনে করে আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতে সীতেশ ঈষৎ অধীরভাবে বললেন, দেখো, এসব কথা তুমি এইমাত্র বানিয়ে বলছ। তুমি ভুলে গেছ যে খানিক আগে তুমি বলেছ যে, সেই Bতে রিণীর সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। তোমার মিথ্যে কথা হাতে-হাতে ধরা পড়েছে।

সোমনাথ তিলমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন, আগে যা বলেছিলুম সেই কথাটাই মিথ্যে, আর এখন যা বলছি তাই সত্যি। গল্পের একটা শেষ হওয়া চাই বলে আমি ঐ জায়গায় শেষ করেছিলুম। কিন্তু

প্রকৃত জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা অমন করে শেষ হয় নি। সে প্যারিসের দেখাও শেষ দেখা নয়, তার পর লণ্ডনে রিণীর সঙ্গে আমার বহু বার অমন শেষ দেখা হয়েছে।

সীতেশ বললেন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে। এর একটা শেষ হয়েছে না হয় নি?

হয়েছে।

কি করে?

বিয়ের বছরখানেক পরেই জর্জের সঙ্গে রিণীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আদালতে প্রমাণ হয় যে, জর্জ রিণীকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন— তাও আবার মদের ঝোঁকে নয়, ভালোবাসার বিকারে। তার পর রিণী স্পেনের একটি কন্‌ভেণ্টে চিরজীবনের মত আশ্রয় নিয়েছে।

সীতেশ মহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, জর্জ তার প্রতি ঠিক ব্যবহারই করেছিল। আমি হলেও তাই করতুম।

সোমনাথ বললেন, সম্ভবত ও অবস্থায় আমিও তাই করতুম। ও ধর্মজ্ঞান, ও বলবীর্য আমাদের সকলেরই আছে। এইজন্যই তো তুর্বলের পক্ষে— O crux! ave unica spera[১] এই হচ্ছে মানবমনের শেষ কথা।

সীতেশ উত্তর করলেন, তোমার বিশ্বাস, তোমার রিণী একটি অবলা— জান সে কি? একসঙ্গে চোর আর পাগল।

সোমনাথ ইতিমধ্যে একটি সিগরেট ধরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বললেন, আমি যে বিশেষ অনুকম্পার পাত্র এমন তো আমার মনে হয় না। কেননা, পৃথিবীতে যে ভালোবাসা খাঁটি তার ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা তুইই থাকে, ঐটুকুই তো ওর রহস্য!

সীতেশের কানে এ কথা এতই অদ্ভুত, এতই নিষ্ঠুর ঠেকল যে, তা শুনে

---

১ ক্রশ! তুমি জীবনের একমাত্র ভরসা।

তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কি উত্তর করবেন ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে রইলেন।

সেন বললেন, বাঃ, সোমনাথ বাঃ! এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা বলেছ— এর মধ্যে যেমন নূতনত্ব আছে তেমনি বুদ্ধির খেলা আছে। আমাদের মধ্যে তুমিই কেবল মনোজগতে নিত্য নতুন সত্যের আবিষ্কার করতে পার।

সীতেশ আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি— এ কথা যে কতদূর সত্য, তোমাদের এইসব প্রলাপ শুনলে তা বোঝা যায়।

সোমনাথ তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না, অর্থাৎ কেউ তাঁর লেজে পা দিলে তিনি তখনি উলটে তাকে ছোবল মারতেন, আর সেইসঙ্গে বিষ ঢেলে দিতেন। যে কথা তিনি শানিয়ে বলতেন সে কথা প্রায়ই বিষদিগ্ধ বাণের মত লোকের বুকে গিয়ে বিঁধত।

সোমনাথের মতের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ কোনো মিল ছিল না তার প্রমাণ তো তাঁর প্রণয়কাহিনী থেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। গরল তাঁর কণ্ঠে থাকলেও, তাঁর হৃদয়ে ছিল না। হাড়ের মত কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মত কোমল দেহ থাকে, সোমনাথেরও তেমনি অতিকঠিন মতামতের ভিতর অতিকোমল মনোভাব লুকিয়ে থাকত। তাই তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত না, যা হত তা হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য ; কেননা, তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হোক, তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত— যে সত্য আমরা দেখতে চাই নে বলে দেখতে পাই নে।

এতক্ষণ আমরা গল্প বলতে ও শুনতে এতই নিবিষ্ট ছিলুম যে, বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর আমাদের কারো হয় নি। সকলে যখন চুপ করলেন সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ কেটে গেছে আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারিদিক

ভরে গেছে, আর সে আলো এতই নির্মল, এতই কোমল যে, আমার মনে হল যেন বিশ্ব তার বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয় কত মধুর আর কত করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখতে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন-রাত্তিরের মত পালায় পালায় নিত্য যায় আর আসে।

অতঃপর আমি আমার কথা শুরু করলুম।

আমার কথা

সোমনাথ বলেছেন : Love is both a mystery and a joke। এ কথা যে এক হিসেবে সত্য তা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য ; কেননা, এই ভালোবাসা নিয়ে মানুষে কবিত্বও করে, রসিকতাও করে। সে কবিত্ব যদি অপার্থিব হয়, আর সে রসিকতা যদি অশ্লীল হয়, তাতেও সমাজ কোনো আপত্তি করে না। দান্তে এবং বক্কাচ্চিও উভয়েই এক যুগের লেখক— শুধু তাই নয়, এর একজন হচ্ছেন গুরু, আর-একজন শিষ্য। ডন জুয়ান এবং এপিসিকিডিয়ন, দুই কবিবন্ধুতে এক ঘরে পাশাপাশি বসে লিখেছিলেন। সাহিত্যসমাজে এইসব পৃথকপন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে তা তো তোমরা সকলেই জান।

এ কথা শুনে সেন বললেন, বায়রন এবং শেলি ও-দুটি কাব্য যে এক সময়ে একসঙ্গে বসে লিখেছিলেন, এ কথা আমি আজ এই প্রথম শুনলুম।

আমি উত্তর করলুম, যদি না করে থাকেন তা হলে তাঁদের তা করা উচিত ছিল। সে যাই হোক, তোমরা যেসব ঘটনা বললে তা নিয়ে আমি তিনটি দিব্যি হাসির গল্প রচনা করতে পারতুম, যা পড়ে মানুষ খুশি হত। সেন কবিতায় যা পড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন ; সীতেশ জীবনে যা পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন ; আর সোমনাথ মানবজীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিন জনই সমান আহাম্মক বনে গেছেন। কোনো বৈষ্ণব কবি বলেছেন যে, জীবনের পথ প্রেমে পিচ্ছিল ; কিন্তু সেই পথে কাউকে পা পিছলে পড়তে দেখলে মানুষের যেমন আমোদ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমরা, যে ভালোবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিস,

তার ভিতর দু-চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে ও—বস্তুকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছ যে সমাজের চোখে তা কলুষিত ঠেকতে পারে। কেননা সমাজের চোখ মানুষের মনকে হয় সূর্যের আলোয় নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো। সে আলোর মায়া এখন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে সরে গিয়েছে। সুতরাং আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, তার ভিতর আর যাই থাক্ আর না থাক্, কোনো হাস্যকর কিংবা লজ্জাকর পদার্থ নেই।

এ গল্পের ভূমিকাস্বরূপে আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই ; কেননা, তোমাদের যা বলতে যাচ্ছি, তা আমার মনের কথা নয়, আর-একজনের— একটি স্ত্রীলোকে। এবং সে রমণী আর যাই হোক, চোরও নয় পাগলও নয়।

গত জুন মাসে আমি কলকাতায় একা ছিলুম। আমার বাড়ি তো তোমরা সকলেই জান। ঐ প্রকাণ্ড পুরীতে রাত্তিরে খালি দুটি লোক শুত— আমি আর আমার চাকর। বহুকাল থেকে একা থাকবার অভ্যেস নেই, তাই রাত্তিরে ভালো ঘুম হত না। একটু কিছু শব্দ শুনলে মনে হত, যেন ঘরের ভিতর কে আসছে— অমনি গা ছম-ছম করে উঠত। আর রাত্তিরে, জানই তো, কতরকম শব্দ হয়— কখনো ছাদের উপর, কখনো দরজা-জানালায়, কখনো রাস্তায়, কখনো-বা গাছপালায়। একদিন এইসব নিশাচর ধ্বনির উপদ্রবে রাত একটা পর্যন্ত জেগে ছিলুম, তার পর ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন কে টেলিফোনে ঘণ্টা দিচ্ছে। অমনি ঘুম ভেঙে গেল। সেইসঙ্গে ঘড়িতে দুটো বাজল। তার পর শুনি যে, টেলিফোনের ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। আমি ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। মনে হল যে, আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারো হয়তো হঠাৎ কোনো বিশেষ বিপদ ঘটেছে, তাই এত রাত্তিরে আমাকে খবর দিচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে

বারান্দায় এসে দেখি, আমার ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটি নিজেই তুলে নিয়ে কানে ধরে বললুম, হ্যালো!

উত্তরে পাওয়া গেল শুধু ঘণ্টার সেই ভোঁভোঁ আওয়াজ। তার পর দু-চার বার 'হ্যালো' 'হ্যালো' করবার পর একটি অতি মৃদু অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। জান, সে কিরকম স্বর? গির্জার অরগানের সুর যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, আর মনে হয় যে সে সুর লক্ষ যোজন দূর থেকে আসছে, ঠিক সেইরকম।

ক্রমে সেই স্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আমি শুনলুম, কে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছে— তুমি কি মিস্টার রায়?

হাঁ। আমি একজন মিস্টার রায়।

এস্. ডি.?

হাঁ, কাকে চাও?

তোমাকেই।

গলার স্বর ও কথার উচ্চারণে বুঝলুম, যিনি কথা কচ্ছেন তিনি একটি ইংরেজ রমণী।

আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কে?

চিনতে পারছ না?

না।

একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তো এ কণ্ঠস্বর তোমার পরিচিত কি না।

মনে হচ্ছে এ স্বর পূর্বে শুনেছি, তবে কোথায় আর কবে তা কিছুতেই মনে করতে পারছি নে।

আমি যদি আমার নাম বলি তা হলে কি মনে পড়বে?

খুব সম্ভব পড়বে।

আমি আনি।

কোন্ আনি?

৫

বিলেতে যাকে চিনতে।

বিলেতে তো আমি অনেক আনিকে চিনতুম। সে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তো ঐ একই নাম।

মনে পড়ে তুমি গর্ডন স্কোয়ারে একটি বাড়িতে তুটি ঘর ভাড়া করে ছিলে ?

তা আর মনে নেই ? আমি যে একাদিক্রমে তুই বৎসর সেই বাড়িতে থাকি।

শেষ বৎসরের কথা মনে পড়ে ?

অবশ্য। সে তো সেদিনের কথা ; বছর-দশেক হল সেখান থেকে চলে এসেছি।

সেই বৎসর সে বাড়িতে আনি ব'লে একটি দাসী ছিল, মনে আছে ?

এই কথা বলবামাত্র আমার মনে পূর্বস্মৃতি সব ফিরে এল। আনির ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল।

আমি বললুম, খুব মনে আছে। দাসীর মধ্যে তোমার মত সুন্দরী বিলেতে কখনো দেখি নি।

আমি সুন্দরী ছিলুম তা জানি, কিন্তু আমার রূপ তোমার চোখে যে কখনো পড়েছে তা জানতুম না।

কি করে জানবে ? আমার পক্ষে ও কথা তোমাকে বলা অভদ্রতা হত।

সে কথা ঠিক। তোমার আমার ভিতর সামাজিক অবস্থার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল।

আমি এ কথার কোনো উত্তর দিলুম না। একটু পরে সে আবার বললে, আমিও আজ তোমাকে এমন-একটি কথা বলব যা তুমি জানতে না।

কি বলো তো ?

আমি তোমাকে ভালোবাসতুম।

সত্যি ?

এমন সত্য যে, দশ বৎসরের পরীক্ষাতেও তা উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ কথা কি করে জানব ? তুমি তো আমাকে কখনো বল নি।

তোমাকে ও কথা বলা যে আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তা ছাড়া ও জিনিস তো ব্যবহারে চেহারায় ধরা পড়ে। ও কথা অন্তত স্ত্রীলোকে মুখ ফুটে বলে না।

কই, আমি তো কখনো কিছু লক্ষ্য করি নি।

কি করে করবে, তুমি কি কখনো মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখেছ ? আমি প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বসবার ঘরে টেবিল সাজিয়েছি, তুমি সে সময় হয় খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে, নয় মাথা নীচু করে ছুরি দিয়ে নখ চাঁচতে।

এ কথা ঠিক। তার কারণ, তোমার দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়াটাও আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তবে সময়ে সময়ে একটুকু অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, আমার ঘরে এলে তোমার মুখ লাল হয়ে উঠত, আর তুমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে। আমি ভাবতুম, সে ভয়ে।

সে ভয়ে নয়, লজ্জায়। কিন্তু তুমি যে কিছু লক্ষ্য কর নি, সেইটেই আমার পক্ষে অতি সুখের হয়েছিল।

কেন ?

তুমি যদি আমার মনের কথা জানতে পারতে তা হলে আমি আর লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারতুম না, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতুম। তা হলে আমিও আর তোমাকে নিত্য দেখতে পেতুম না, তোমার জন্যে কিছু করতেও পারতুম না।

আমার জন্য তুমি কি করেছ ?

সেই শেষ বৎসর তোমার একদিনও কোনো জিনিসের অভাব হয়েছে, একদিনও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে ?

না।

তার কারণ, আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি। জান, তোমাকে যে ভালো না বাসে, সে কখনো তোমার সেবা করতে পারে না।

কেন বল দেখি ?

এই জন্যে যে, তুমি নিজের জন্য কিছু করতে পার না, অথচ তোমার জন্য কাউকে কিছু করতেও বল না।

তুমি যে আমার জন্যে সব করে দিতে আমি তো তা জানতুম না। আমি ভাবতুম মিসেস স্মিথ। তাইতে আসবার সময় তোমাকে কিছু না বলে মিসেস স্মিথকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।

আমি তোমার ধন্যবাদ চাই নি। তুমি যে আমাকে কখনো ধমকাও নি, সেই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট পুরস্কার।

সে কি কথা! স্ত্রীলোককে কোনো ভদ্রলোক কি কখনো ধমকায় ?

স্ত্রীলোককে কেউ না ধমকালেও, দাসীকে অনেকেই ধমকায়।

দাসী কি স্ত্রীলোক নয় ?

দাসীরা জানে তারা স্ত্রীলোক, কিন্তু ভদ্রলোকে সে কথা দু বেলা ভুলে যায়।

কথাটা এতই সত্য যে, আমি তার কোনো জবাব দিলুম না। একটু পরে সে বললে, কিন্তু একদিন তুমি একটি অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে।

তোমাকে ?

আমাকে নয়, তোমার একটি বন্ধুকে, কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে।

তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো বন্ধুকে কখনো কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

তোমার কাছে সে এত তুচ্ছ কথা যে তোমার তা মনে থাকবার কথা নয়— কিন্তু আমার মনে তা চিরদিন কাঁটার মত বিঁধে ছিল।

শুনলে হয় তো মনে পড়বে।

তুমি একদিন একটি মুক্তোর টাই-পিন নিয়ে এস, তার পর দিন সেটি আর পাওয়া গেল না।

হতে পারে।

আমি সেটি সারা রাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোমার একটি বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ; তুমি তাঁকে হেসে বললে যে,

আনি ওটি চুরি করে ঠকেছে, কেননা মুক্তোটি হচ্ছে ঝুটো, আর পিনটি পিতলের ; আনি বেচতে গিয়ে দেখতে পাবে যে, ওর দাম এক পেনি। তার পর তোমরা দুজনেই হাসতে লাগলে। কিন্তু ঐ কথায় তুমি ঐ পিতলের পিনটি আমার বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিয়েছিলে।

আমরা না ভেবেচিন্তে অমন অন্যায় কথা অনেক সময় বলি।

তা আমি জানতুম, তাই তোমার উপর আমার রাগ হয় নি— যা হয়েছিল সে শুধু যন্ত্রণা। দারিদ্র্যের কষ্টের চাইতে তার অপমান যে বেশি, সেদিন আমি মর্মে মর্মে তা অনুভব করেছিলুম। তুমি কি করে জানবে যে, আমি তোমার এক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডারও কখনো চুরি করি নি।

এর উত্তরে আমার আর কিছুই বলবার নেই। না জেনে হয়তো ঐরকম কথায় কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছি।

তোমার মুক্তোর পিন কে চুরি করেছিল পরে আমি তা আবিষ্কার করি।

কে বলো তো ?

তোমার ল্যাণ্ড্‌লেডি মিসেস স্মিথ।

বল কি! সে তো আমাকে মায়ের মত ভালোবাসত! আমি চলে আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সে তার ব্যাঙ্ক ফেল হল বলে।— তোমাকে সে এক টাকার জিনিস দিয়ে দু টাকা নিত।

আমি কি তা হলে অতদিন চোখ বুজে ছিলুম ?

তোমাদের চোখ তোমাদের দলের বাইরে যায় না, তাই বাইরের ভালোমন্দ কিছুই দেখতে পায় না। সে যাই হোক, আমি তোমার একটি জিনিস না বলে নিতুম— বই, আবার তা পড়ে ফিরে দিতুম।

তুমি কি পড়তে জানতে ?

ভুলে যাচ্ছ, আমরা সকলেই বোর্ড স্কুলে লেখাপড়া শিখি।

হাঁ, তা তো সত্যি।

জান, কেন চুরি করে বই পড়তুম ?

না।

ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছিলেন, আমি তা যত্ন করে মেজেঘষে রাখতুম।

তা আমি জানি। তোমার মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দাসী আমি বিলেতে দেখি নি।

তুমি যা জনতে না তা হচ্ছে এই— ভগবান আমাকে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন, তাও আমি মেজেঘষে রাখতে চেষ্টা করতুম, এবং এ দুইই করতুম তোমারই জন্যে।

আমার জন্যে ?

পরিষ্কার থাকতুম এই জন্যে, যাতে তুমি আমাকে দেখে নাক না সিঁটকাও ; আর বই পড়তুম এই জন্যে, যাতে তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারি।

আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো কথা কইতুম না।

আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে তখন আমার তা শুনতে বড় ভালো লাগত। সে তো কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি। আমি অবাক হয়ে শুনতুম, কিন্তু সব ভালো বুঝতে পারতুম না। কেননা, তোমরা যে ভাষা বলতে তা বইয়ের ইংরেজি। সেই ইংরেজি ভালো করে শেখবার জন্য আমি চুরি করে বই পড়তুম।

সেসব বই বুঝতে পারতে ?

আমি পড়তুম শুধু গল্পের বই। প্রথমে জায়গায় জায়গায় শক্ত লাগত, তার পর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বাধত না।

কিরকম গল্পের বই তোমার ভালো লাগত ? যাতে চোর-ডাকাত খুন-জখমের কথা আছে ?

না, যাতে ভালোবাসার কথা আছে। সে যাই হোক, তোমাকে

ভালোবেসে তোমার দাসীর এই উপকার হয়েছিল যে, সে শরীরে-মনে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই তার ভবিষ্যৎ জীবন এত সুখের হয়েছিল।

আমি শুনে সুখী হলুম।

কিন্তু প্রথমে আমাকে ওর জন্য অনেক ভুগতে হয়েছিল।

কেন ?

তোমার মনে আছে, তুমি চলে আসবার সময় বলেছিলে যে, এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরে আসবে ?

সে ভদ্রতা করে, মিসেস স্মিথ দুঃখ করছিল ব'লে তাকে স্তোক দেবার জন্যে।

কিন্তু আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলুম।

তুমি কি এত ছেলেমানুষ ছিলে ?

আমার মন আমাকে ছেলেমানুষ করে ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়ে দিলে জীবনে যে আর কিছু ধরে থাকবার মত আমার ছিল না।

তার পর ?

তুমি যেদিন চলে গেলে তার পরদিনই আমি মিসেস স্মিথের কাছ থেকে বিদায় হই।

মিসেস স্মিথ তোমাকে বিনা নোটিশে ছাড়িয়ে দিলে ?

না, আমি বিনা নোটিশে তাকে ছেড়ে গেলুম। ও শ্মশানপুরীতে আমি আর এক দিনও থাকতে পারলুম না।

তার পর কি করলে ?

তার পর এক বৎসর ধরে যেখানে যেখানে তোমার দেশের লোকেরা থাকে, সেইসব বাড়িতে চাকরি করেছি— এই আশায় যে, তুমি ফিরে এলে সে খবর পাব। কিন্তু কোথাও এক মাসের বেশি থাকতে পারি নি।

কেন, তারা কি তোমাকে বকত, গাল দিত ?

না, কটু কথা নয়, মিষ্টি কথা বলত বলে। তুমি যা করেছিলে— অর্থাৎ উপেক্ষা— এরা কেউ আমাকে তা করে নি। আমার প্রতি এঁদের বিশেষ মনোযোগটাই আমার কাছে বিশেষ অসহ্য হত।

মিষ্টি কথা যে মেয়েদের তিতো লাগে এ তো আমি আগে জানতুম না।

আমি মনে আর দাসী ছিলুম না, তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্রকথার পিছনে যে মনোভাব আছে তা মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ যৌবন দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি। জান, কিসের সাহায্যে ?

না।

আমি আমার শরীরে এমন-একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম যার গুণে কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

সেটি কি ক্রশ ?

বিশেষ করে আমার পক্ষেই তা ক্রশ ছিল, অন্য কারো পক্ষে নয়। তুমি যাবার সময় আমাকে যে গিনিটি বকশিশ দাও সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালোবাসা ছিল, আমার বুকের উপরে ওই স্বর্ণমুদ্রা ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করি নি, যদিচ আমার এমন দিন গেছে যখন আমি খেতে পাই নি।

এমন এক দিনও তোমার গেছে যখন তোমাকে উপবাস করতে হয়েছে ?

একদিন নয়, বহুদিন। যখন আমার চাকরি থাকত না তখন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে উপবাস করতে হত।

কেন, তোমার বাপ-মা ভাই-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজন কি কেউ ছিল না ?

না, আমি জন্মাবধি একটি Foundling Hospitalএ মানুষ হই।

কত বৎসর ধরে তোমাকে এ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে ?

এক বৎসরও নয়। তুমি চলে যাবার মাস-দশেক পরে আমার এমন

ব্যারাম হল যে, আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হল। সেইখানেই আমি এসব কষ্ট হতে মুক্তি লাভ করলুম।

তোমার কি হয়েছিল ?

যক্ষ্মা।

রোগেরও তো একটা যন্ত্রণা আছে ?

যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোনোই কষ্ট থাকে না, বরং যদি কিছু থাকে তো সে আরাম। তাই যে ক-মাস আমি হাঁসপাতালে ছিলুম তা আমার অতি সুখেই কেটে গিয়েছিল।

মরণাপন্ন অসুখ নিয়ে হাঁসপাতালে একা পড়ে থাকা যে সুখের হতে পারে এ আজ নতুন শুনলুম।

এ ব্যারামের প্রথম অবস্থায় মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মনে হয়, এতে প্রাণ হঠাৎ একদিনে নিবে যাবে না। সে প্রাণ দিনের পর দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অলক্ষিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যু কতকটা ঘুমিয়ে পড়ার মত। তা ছাড়া, শরীরের ও অবস্থায় শরীরের কোনো কাজ থাকে না বলে সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখা যায়— আমি তাই শুধু সুখস্বপ্ন দেখতুম।

কিসের ?

তোমার। আমার মনে হত যে, একদিন হয়তো তুমি এই হাঁসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি নিত্য তোমার প্রতীক্ষা করতুম।

তার যে কোনোই সম্ভাবনা ছিল না তা কি জানতে না ?

যক্ষ্মা হলে লোকের আশা অসম্ভবরকম বেড়ে যায়। সে যাই হোক, তুমি যদি আসতে তা হলে আমাকে দেখে খুশি হতে।

তোমার ঐ রুগ্‌ণ চেহারা দেখে আমি খুশি হতুম, এরূপ অদ্ভুত কথা তোমার মনে কি করে হল ?

সেই ইটালিয়ান পেণ্টারের নাম কি, যার ছবি তুমি এত ভালোবাসতে যে সমস্ত দেয়ালময় টাঙিয়ে রেখেছিলে ?

বট্টিচেল্লি।

হাঁ, তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক বট্টিচেল্লির ছবির মত হয়েছিল। হাত-পাগুলি সরু সরু আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখদুটো বড় বড়, আর তারাদুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রঙ হাতির দাঁতের রঙের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত। আমি জানি যে, তোমার চোখে সে চেহারা বড় সুন্দর লাগত।

তুমি কতদিন হাঁসপাতালে ছিলে?

বেশি দিন নয়। যে ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করতেন তিনি মাসখানেক পরে আবিষ্কার করলেন যে, আমার ঠিক যক্ষ্মা হয় নি, শীতে আর অনাহারে শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাঁর যত্নে ও সুচিকিৎসায় আমি তিন মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলুম।

তার পর?

তার পর আমার যখন হাঁসপাতাল থেকে বেরবার সময় হল, তখন ডাক্তারটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি বেরিয়ে কি করব? আমি উত্তর করলুম, দাসীগিরি। তিনি বললেন যে, তোমার শরীর যখন একবার ভেঙে পড়েছে তখন জীবনে ওরকম পরিশ্রম করা তোমার দ্বারা আর চলবে না। আমি বললুম, উপায়ান্তর নেই। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমি যদি নর্স্ হতে রাজি হই তো তার জন্য যা দরকার সমস্ত খরচা তিনি দেবেন। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল, কেননা, জীবনে এই আমি সব-প্রথম একটি সহৃদয় কথা শুনি। আমি সে প্রস্তাবে রাজি হলুম। এত শিগগির রাজি হবার আরো একটি কারণ ছিল।

কি?

আমি মনে করলুম, নর্স্ হয়ে আমি কলকাতায় যাব। তা হলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমার অসুখ হলে তোমার শুশ্রূষা করব।

আমার অসুখ হবে, এমন কথা তোমার মনে হল কেন ?

শুনেছিলুম, তোমাদের দেশ বড়ই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে নাকি সব সময়েই সকলের অসুখ করে।

তার পরে সত্যসত্যই নর্স হলে ?

হাঁ। তার পরে সেই ডাক্তারটি আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন। আমি আমার মন ও প্রাণ আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাতে সমর্পণ করলুম।

তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে ?

পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আমার স্বামীর কাছে আমি যা পেয়েছি সে হচ্ছে পদ ও সম্পদ, ধন ও মান, অসীম যত্ন এবং অকৃত্রিম স্নেহ। একটি দিনের জন্যও তিনি আমাকে তিলমাত্র অনাদর করেন নি, একটি কথাতেও কখনো মনে ব্যথা দেন নি।

আর তুমি ?

আমার বিশ্বাস, আমিও তাঁকে মুহূর্তের জন্যও অসুখী করি নি। তিনি তো আমার কাছে কিছু চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু আমাকে ভালোবাসতে ও আমার সেবা করতে। বাপ চিররুগ্‌ণ মেয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, তিনি আমার সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছিলেন। আমি সেরে উঠলেও আর আগের শরীর ফিরে পাই নি, বরাবর সেই বট্টিচেল্লির ছবিই থেকে গিয়েছিলুম— আর আমার স্বামী আমার বাপের বয়সীই ছিলেন। তাঁকে আমি আমার সকল মন দিয়ে দেবতার মত পুজো করেছি।

আশা করি তোমাদের বিবাহিত জীবনের উপর আমার স্মৃতির ছায়া পড়ে নি ?

তোমার স্মৃতি আমার জীবন-মন কোমল করে রেখেছিল।

তা হলে তুমি আমাকে ভুলে যাও নি ?

না। সেই কথাটা বলবার জন্যই তো আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার প্রতি আমার মনোভাব বরাবর একই ছিল।

বলতে চাও, তুমি তোমার স্বামীকে ও আমাকে দুজনকে একসঙ্গে ভালোবাসতে ?

অবশ্য। মানুষের মনে অনেকরকম ভালোবাসা আছে, যা পরস্পর-বিরোধ না করে একসঙ্গে থাকতে পারে। এই দেখো-না কেন, লোকে বলে যে, শত্রুকে ভালোবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, শত্রু-মিত্র-নির্বিচারে যে যন্ত্রণা ভোগ করছে তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, সমান ভালোবাসা হতে পারে।

এ সত্য কোথায় আবিষ্কার করেছ ?

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে।

তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে ?

বলছি। এই যুদ্ধে আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলুম, তিনি ডাক্তার হিসেবে, আমি নর্স্ হিসেবে— সেইখান থেকে এই তোমার কাছে আসছি, যে কথা আগে বলবার সুযোগ পাই নি, সেই কথাটি বলবার জন্য।

তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি নে।

এর ভিতর হেঁয়ালি কিছু নেই। এই ঘণ্টাখানেক আগে তোমার সেই বট্টিচেল্লির ছবি একটি জর্মান গোলার আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে— অমনি আমি তোমার কাছে চলে এসেছি।

তা হলে এখন তুমি—?

পরলোকে।

এর পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে চলে এলুম। মুহূর্তে আমার শরীর-মন একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি শোবামাত্র ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। তার পরদিন সকালে চোখ খুলে দেখি, বেলা দশটা বেজে গেছে।

•

কথা শেষ করে বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি, রূপকথা শোনবার সময়

ছোট ছেলেদের মুখের যেমন ভাব হয় সীতেশের মুখে ঠিক সেই ভাব। সোমনাথের মুখ কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলুম, তিনি নিজের মনের উদ্‌বেগ জোর করে চেপে রাখছেন। আর সেনের চোখ ঢুলে আসছে— ঘুমে কি ভাবে, বলা কঠিন। কেউ 'হুঁ' 'না'-ও করলেন না। মিনিট-খানেক পরে বাইরে গির্জের ঘণ্টায় বারোটা বাজলে, আমরা সকলে একসঙ্গে উঠে পড়ে 'বয়' 'বয়' বলে চীৎকার করলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে দেখি, চাকরগুলো সব মেজেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমচ্ছে। চাকরগুলোকে টেনে তুলে গাড়ি জুততে বলতে নীচে পাঠিয়ে দিলুম।

হঠাৎ সীতেশ বলে উঠলেন, দেখো রায়, তুমি একজন লেখক; দেখো এসব গল্প যেন কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো না, তা হলে আমি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। আমি উত্তর করলুম, সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না— তাতে তোমরা আমার উপর খুশিই হও আর রাগই কর। সেন বললেন, আমার কোনো আপত্তি নেই; আমি যা বললুম তা আগাগোড়া সত্য, কিন্তু সকলে ভাববে যে তা আগাগোড়া বানানো। সোমনাথ বললেন, আমারও কোনো আপত্তি নেই, আমি যা বললুম তা আগাগোড়া বানানো কিন্তু লোকে ভাববে যে তা আগাগোড়া সত্যি। আমি বললুম, আমি যা বললুম তা ঘটেছিল, কি, আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, তা আমি নিজেও জানি নে। সেজন্যই তো এসব গল্প লিখে ছাপাব। পৃথিবীতে দু রকম কথা আছে যা বলা অন্যায়— এক হচ্ছে মিথ্যা, আর-এক হচ্ছে সত্য। যা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, আর না হয়তো একই সঙ্গে দুই, তা বলায় বিপদ নেই।

সীতেশ বললেন, তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের একজন কবি, একজন ফিলজফার, আর-একজন সাহিত্যিক; সুতরাং তোমাদের কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যে তা কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি হচ্ছি সহজ মানুষ, হাজারে ন শো নিরানব্বই জন যেমন হয়ে

থাকে তেমনি। আমার কথা যে খাঁটি সত্য, পাঠকমাত্রেই তা নিজের মন দিয়েই যাচাই করে নিতে পারবে।

আমি বললুম, যদি সকলের মনের সঙ্গে তোমার মনের মিল থাকে তা হলে তোমার মনের কথা প্রকাশ করায় তো তোমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। সীতেশ বললেন, বাঃ, তুমি তো বেশ বললে! আর পাঁচজন যে আমার মত এ কথা সকলে মনে মনে জানলেও কেউ মুখে তা স্বীকার করবে না, মাঝ থেকে আমি শুধু বিদ্রূপের ভাগী হব। এ কথা শুনে সোমনাথ বললেন, দেখো রায়, তা হলে এক কাজ করো— সীতেশের গল্পটা আমার নামে চালিয়ে দাও আর আমার গল্পটা সীতেশের নামে— এ প্রস্তাবে সীতেশ অতিশয় ভীত হয়ে বললেন, না না, আমার গল্প আমারই থাক্। এতে নয় লোকে ঠাট্টা করবে, কিন্তু সোমনাথের পাপ আমার ঘাড়ে চাপলে আমাকে ঘর ছাড়তে হবে।

এর পরে আমরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলুম।

১৯১৬ জানুয়ারি

'চার-ইয়ারি'র স্ত্রীপর্ব

আমি বিলেত থেকে এ দেশে ফিরে আসবার বছর-দশেক পরে 'চার-ইয়ারি-কথা' বলে একখানা গল্পের বই লিখি। সে গল্প ক'টি পড়ে সেকালে যুবক-সম্প্রদায়ের চটক লাগে। এবং সমালোচক-দলের কাছে নতুন বলে গ্রাহ্য হয়। দু-চার জন সমালোচক লেখেন যে, গল্প ক'টি ফরাসি থেকে চুরি। যদিচ তাঁরা ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেউ কেউ লেখেন যে, আনাটোল ফ্রান্সের গল্প থেকে চুরি। যদি আনাটোল ফ্রান্সের গল্পের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় থাকত তা হলে তাঁরা আমাকে এই চুরির দায়ে দোষী করতেন না। অনেকে মুখে আমাকে বলেছেন যে, এই গল্প-চারটির নায়িকাদের সঙ্গে বিলেতে আমার পরিচয় ছিল। প্রথম নায়িকা হচ্ছে পাগল, দ্বিতীয়টি চোর, তৃতীয়টি জুয়াচোর, আর চতুর্থটি ভূত। বলা বাহুল্য একরকম চারটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের নায়িকার একটির পর একটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। এই চারটিই আমার মনগড়া। তবে, এর ভিতর তৃতীয় গল্পের নায়িকার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, যাকে আমি রিণী নামে গড়ে তুলেছি।

এ গল্পের ঘটনা ও কথোপকথন সবই আমার স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু আমি এমন-একটি যুবতীকে জানতুম, যাকে রিণীর রূপ দেওয়া যায়। তার যথার্থ নাম ছিল কাতি, ইংরেজি Katieর ফরাসি উচ্চারণ। এই নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, সে আধা-ফরাসি আধা-ইংরেজ। তার মুখে শুনেছি যে, সে অল্পবয়সে ব্রাসেল্‌সে থাকত, সেখানকার conservatoireএ ভালো করে গানবাজনা শেখবার জন্যে। আমি তাকে কখনও গান গাইতে কিংবা বাজাতে শুনি নি; কিন্তু সে যে ফরাসি বলতে পারত, তার পরিচয় আমি পেয়েছি। সে ছিল অভিজাত-বংশীয়া। যদি তার কথা বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে তার ঠাকুরদা ছিলেন ভারতবর্ষে একটি জেনারেল। তার বাবাও ছিলেন একটি মিলিটারি অফিসার। তার পর তিনি কোনো দুষ্কর্ম করায় দেশত্যাগী হয়েছিলেন। কাতির মা দিদি ও কাতিকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় ফেলে তিনি পলাতক হন। এবং তখন পর্যন্ত তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। এই সময়ে জেনারেল ফ্রেঞ্চ কাতিদের কিছু কিছু মাসহারা দিয়ে ভরণপোষণ করতেন। এবং সম্ভবত তিনিই তাদের ব্রাসেল্‌সে থাকতে পাঠান। আমি এই ব্রাসেল্‌সের কথা তাকে কখনও জিজ্ঞাসা

করি নি। আমি কাতির মাকে কখনো দেখি নি। তার দিদিকে দেখেছিলুম; সে দেখতে মোটেই সুন্দরী নয়, এবং অত্যন্ত ভালোমানুষ। সে যে কাতির দিদি, তা বিশ্বাস করা কঠিন। কাতি ছিল অতিশয় সুন্দরী এবং অতিশয় চালাক-চতুর। কাতির মুখ ছিল লম্বা ধরনের, নাক লম্বা, চোখও লম্বার দিকে বড়ো; এবং সমস্ত মুখচোখে একটা তীক্ষ্ণভাব ছিল। আমার আর্টিস্ট বন্ধু রোলান্‌ড্ হল্ তার ফোটো দেখে চম্‌কে ওঠেন, এবং তিনি বলেন যে, এই মেয়েটির চোখের তারার রঙ নীল নয়, ভায়লেট। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি ফোটো থেকে কি করে চোখের তারার রঙ বুঝলে?—তিনি উত্তরে বলেন যে, এর পরে তুমি লক্ষ্য করে দেখো তোমার এই বন্ধুটির চোখ ভায়লেট কি না। আমি পরে লক্ষ্য করে দেখি যে, রোলান্‌ড্ হল্‌এর কথাই ঠিক।

আমি সম্প্রতি একখানি বই পড়ছি, যার নাম *Bernard Shaw, his Life and Personality*। তাতে উইলিয়ম মরিস্ নামক একটি প্রসিদ্ধ আর্টিস্ট এবং সাহিত্যিকের কনিষ্ঠা কন্যা মে মরিস্‌এর একখানি ছবি আছে। আমি ছবিখানি যখনই দেখি, তখনই আমার কাতির কথা মনে পড়ে। এমনকি, সময়ে সময়ে ভুল হয় যে ওটা তারই ছবি। আমি এই একটি সত্যিকারের মেয়েকে ভেঙে 'চার-ইয়ারি-কথা'র চারটি নায়িকাকে তৈরি করেছি। আমি তার নামধাম কিছুই জানতুম না, যা তার মুখে শুনেছি তা ছাড়া। এবং বেশি জানবার কোনো কৌতূহলও আমার ছিল না। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে, সে একটি mystery girl। এবং তার জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা আমি সংগত মনে করতুম না, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। উপরন্তু তার ব্যবহার এত অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিত যে, তার থেকে আমার মনে হত তার ভিতর একটু পাগলামির ছিট আছে। দ্বিতীয় গল্পের নায়িকাকে আমি বইয়ের দোকানে প্রথম দেখি, কাতিকেও তাই। তার পর যা-সব লিখেছি, সেসব হচ্ছে সীতেশকে ফোটাবার জন্যে। আর শেষটা সে-নায়িকা যে সীতেশের পাঁচ পাউণ্ড চুরি করে নিয়ে গেল, এ ঘটনা আমার সম্পূর্ণ বানানো। কাতি ক্রিমিনালের মেয়ে, তার পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; তাই আমি তাকে শেষ কাণ্ডে চোর বানিয়েছি। এ কাতি কিন্তু যথার্থ কাতি ছিল না।

'চার-ইয়ারি'র তৃতীয় গল্পে আমি যাকে রিণী বানিয়েছি, তার সঙ্গে যথার্থ

কাতির কিছু সাদৃশ্য আছে। যখন 'চার-ইয়ারি' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাকে বহুলোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, এ গল্পটি real কি না। উত্তরে আমি বলি, তা হলে গল্পটি উত্‌রেছে। কেননা, যা আগাগোড়া কল্পনার জিনিস, অনেক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়েছে। কাতির সঙ্গে আমি ভালোবাসায় পড়ি আর না-পড়ি, সেকালে যুবক-পাঠকের দল অনেকে রিণীর প্রেমে পড়েছিল। আমার একটি ভক্ত বন্ধু কোনো মাসিক পত্রিকায় 'চার-ইয়ারি'র দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তাতে তিনি মুখ ফুটে বলেন যে, রিণীর মতো মেয়ের হাতে পড়ে নাকানি-চোবানি খাওয়াতেও সুখ আছে। আমি তাঁকে বলি, এটা কি লক্ষ্য কর নি যে, রিণীর পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ? আমার বন্ধু উত্তরে বলেন, রিণী যে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্টতুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে— এ কার চোখ এড়িয়ে যায়? কিন্তু সে জীবন্ত মানুষ, জড়পদার্থ নয়, এইখানেই তার বিশেষত্ব। কাতির সঙ্গে রিণীর প্রধান তফাত এই যে, আমি কাতিকে অনেক রঙ চড়িয়ে রিণী বানিয়েছি। রিণী ও তৃতীয় গল্পের নায়ক সোমনাথের কথাবার্তা প্রায় সবই আমার স্বকপোলকল্পিত। তবে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের রক্তমাংসের মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। ফলে, এটি গল্প হয়েছে, অথচ পাঠকের কাছে সত্য ঘটনা বলে ভ্রম হয়।

'চার-ইয়ারি কথা'র চতুর্থ গল্পের নায়িকা হচ্ছে প্রেতাত্মা। সে দেশি কি বিলেতি, এ প্রশ্ন যে কোনো পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

—প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা
'বৈশাখী' ১৩৫২

সবুজ পত্রে মুদ্রিত ১৩২২-২৩
গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯১৬
গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৩০
গল্পসংগ্রহে মুদ্রিত ১৯৪১
নূতন সংস্করণ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সংস্করণের পরিশিষ্টে লেখকের আত্মকথা থেকে "'চার-ইয়ারি'র স্ত্রীপর্ব" যুক্ত হল।

চার-ইয়ারি কথার শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী কৃত ইংরেজি অনুবাদ TALES OF FOUR FRIENDS ১৯৪৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা